প্রগতির ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে

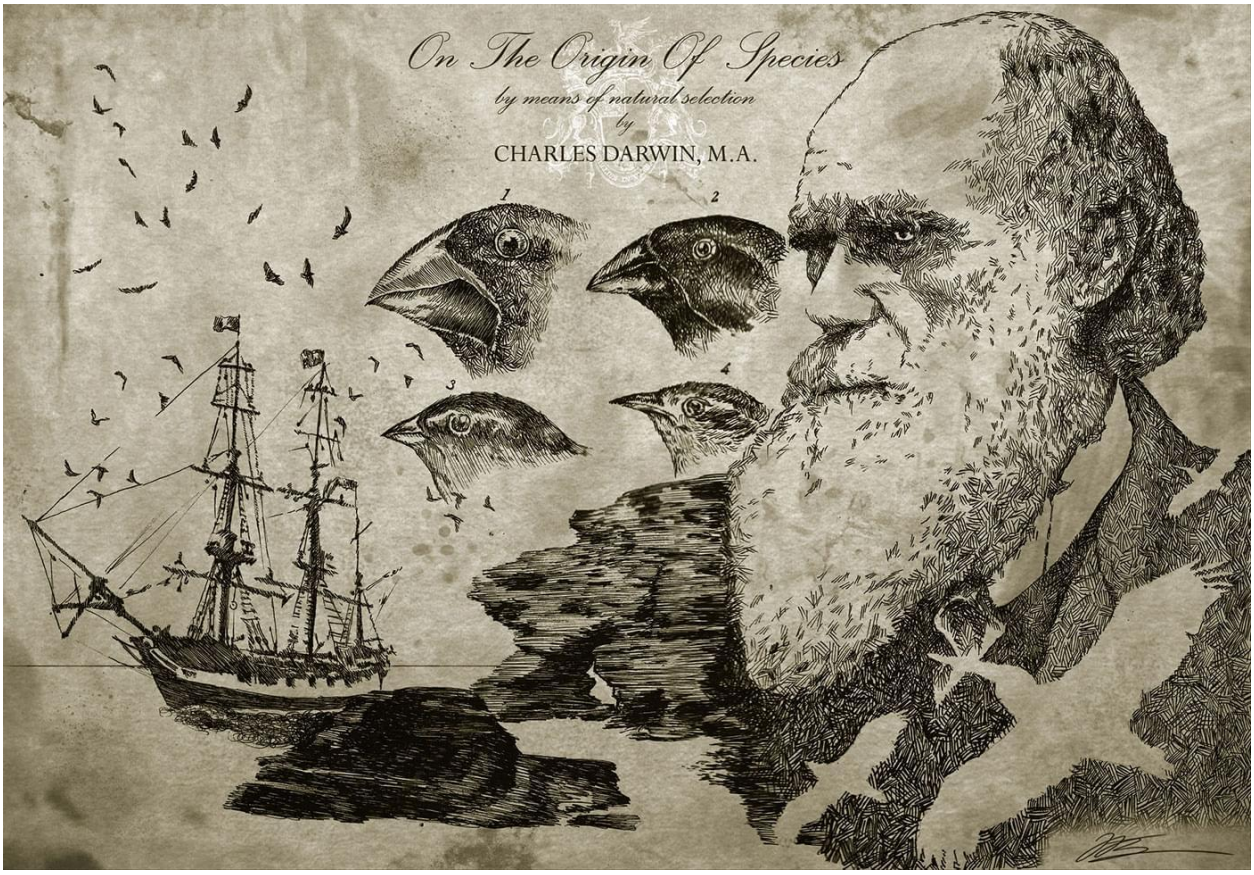

-অমর্ত্য সেন
দার্শনিক

১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'দি অরিজিন অব স্পিসিস' প্রকাশের পর একশো তিরিশ বছরের বেশী পার হয়ে গেছে। এই কালপর্বে ডারউইনের বিবর্তনমূলক প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিজেকে এবং বিশ্বকে দেখার চোখটাই আমূল বদলে দিয়েছে। বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে প্রগতির যে ডারউইনীয় বিশ্লেষণ – শক্তি, ব্যাপকতা ও প্রভাবে তার তুলনা চিন্তার ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। বিবর্তনমূলক প্রগতিকে ডারউইন যেভাবে বুঝেছেন তার কয়েকটি স্বতন্ত্র উপাদান আছে। কতকগুলি উপাদান এতটাই গভীর যে তাতে ডুব দিলে, এমন কতকগুলি আবার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, যেগুলি কার্যত অনির্ভরযোগ্য। নির্দিষ্টভাবে বললে, প্রগতি বিষয়ে ডারউইনের সাধারণ ধারণা – যা তাঁর বিবর্তনমূলক প্রগতির ধারণার ভিত্তি – তা সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে আমাদের নজর ঘুরিয়ে দিতে পারে।

বিবর্তনমূলক প্রগতির ডারউইনীয় বিশ্লেষণের তিনটি স্বতন্ত্র উপাদান আছেঃ ১) বিবর্তন কীভাবে কাজ করে তার বিশ্লেষণ; ২) প্রগতি বলতে কী বোঝায় সেই ধারণা; এবং ৩) বিবর্তনের পথেই যে প্রগতি আসে তা প্রমাণ করা। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি, পৃথিবীতে কী ঘটে চলেছে তার গভীর ব্যাখ্যা দিতে পারে; একটি শক্তিশালী যুক্তিধারার – বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তন ও রূপান্তরকে দেখার পথ খুলে দিতে পারে। যে বিশেষ প্রক্রিয়াগুলির ওপর ডারউইন জোর দিয়েছিলেন সেগুলির যথার্থতা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তোলাই যায়। যেমন, প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্লেষণ কি প্রজাতির (এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলির) নির্বাচনের ভিত্তিতে করা হবে, না কি 'জেনোটাইপ'এর (এবং প্রাসঙ্গিক জেনেটিক ধর্মগুলির) ভিত্তিতে। প্রজাতির সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করাটা সহজ। ডারউইনও তাই করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা বাহিত হয় এবং সেখানেই জেনোটাইপ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রজাতি ও জেনোটাইপের মধ্যে মিল থাকলেও তারা একে অপরের অনুরূপ নয়। কিন্তু তাঁর বিবর্তনবাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকে যদি দেখা হয়, তবে এই সবই গৌণ পার্থক্য। বিবর্তনবাদী বিশ্লেষণের শক্তি ও সুদূরপ্রসারী প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না।

একইভাবে, বিবর্তনের তত্ত্ব অন্য ক্ষেত্রগুলিতে – নির্দিষ্টভাবে বললে 'সামাজিক' ক্ষেত্রে – কতদূর প্রয়োগসাধ্য সে বিষয়ে যুক্তিশীল প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই তত্ত্ব কি প্রতিষ্ঠানের আচরণগত বিধিসমূহের নির্বাচন ও উদবর্তনের (survival) ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় – যে বিষয়ে ডারউইন কোনো ইঙ্গিত করেননি ? সামাজিক অনুসন্ধানের অন্য পদ্ধতিগুলির সঙ্গে বিবর্তনবাদী যুক্তিধারাকে যোগ করার উপযোগিতা যে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার একথাও মনে রাখা দরকার, সামাজিক অনুসন্ধানে এই তত্ত্বের একধরনের চরম প্রয়োগ যে তিক্ত সমালোচনার মুখে পড়েছে, তাও অকারণে নয়। এসব নিয়ে অবশ্য ইতিমধ্যেই বহু আলোচনা হয়েছে। এখানে আমি আর সেগুলো তুলতে চাই না। বিবর্তনমূলক প্রগতির ডারউইনীয় বিশ্লেষণের যে তিনটি উপাদান, তার প্রথমটি নিয়ে অর্থাৎ কীভাবে বিবর্তন কাজ করে তার বিশ্লেষণ নিয়ে – আমি কোনো আপত্তি তুলছি না। আমি নজর দেব ডারউইনের বিশ্লেষণের প্রগতির ধারণার দিকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদানদুটির দিকে।

১. আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের জীবন

প্রগতি সম্পর্কে ডারউইনের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তিনি সেই আলোতেই বিবর্তনের সাফল্যকে দেখেছিলেন। 'অন দি অরিজিন অব স্পিসিস'-এর উপসংহারে তিনি লিখেছিলেনঃ "প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু প্রত্যেকের ভালোর দ্বারা এবং প্রত্যেকের ভালোর জন্য কাজ করে, সুতরাং সমস্ত শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী ত্রুটিহীন উৎকর্ষের দিকেই এগোতে থাকে।" প্রগতিকে তিনি "সর্বোত্তম প্রজাতির অন্তহীন

বৈচিত্র্যের” জন্ম হিসেবে দেখেছেন। “কোনো প্রজাতির যে শ্রেষ্ঠ রূপটি আমরা কল্পনা করতে পারি”, ডারউইনের মতে তা পূর্ববর্তী প্রজন্মের “শ্রেষ্ঠতম জীবের সন্তান”।

‘দি অরিজিন অব স্পিসিস’-এর সর্বশেষ বাক্যটিতে ডারউইন “প্রাণের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির যে বিপুল সমারোহ”-এর কথা বলছেন, তার সঙ্গে আমরা সহজেই সহমত হতে পারি। প্রশ্ন হলো, প্রাণকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয় কি না। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ ধর্ম হলো, আমাদের বৈশিষ্ট্য ও গড়নে মনোনিবেশ। অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যা করতে পারি বা হতে পারি, তার পরিবর্তে “আমরা কী?”, তার ওপর জোর দেয়। এর একটা বিকল্প হতে পারে, আমাদের জীবনযাপনের মানদণ্ডে প্রগতির বিচার করা। দৃষ্টিভঙ্গির এই অ্যারিস্টটলীয় পরিবর্তন জীবনমানের মূল্যায়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং এই মূল্যায়ন করার যৌক্তিকতাও আছে। একই সঙ্গে আবার এই দৃষ্টিভঙ্গিটি, প্রজাতির ‘উন্নতি’(বা জেনেটিক উৎকর্ষ) যে-সব বিষয়কে চাপা দিয়ে রাখে, সে বিষয়গুলির দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

আমাদের এক ধরণের জীবনযাপনের পরিবর্তে অন্য ধরণের জীবনযাপনের সামর্থ্য শুধুমাত্র “আমরা কী” তার ওপর নয়, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করি, তার ওপরেও নির্ভর করে। যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস তাকে আমরা হাজারটা উপায়ে পাল্টানোর চেষ্টা করতে পারি। সুতরাং প্রগতিকে আমরা কোন চোখে দেখছি, আমাদের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প তার মৌলিক বদল ঘটাতে পারে।

"But with regard to the material world, we can at least go so far as this—we can perceive that events are brought about not by insulated interpositions of Divine power, exerted in each particular case, but by the establishment of general laws."

WHEWELL: *Bridgewater Treatise.*

"The only distinct meaning of the word 'natural' is *stated*, *fixed*, or *settled*; since what is natural as much requires and presupposes an intelligent agent to render it so, *i. e.*, to effect it continually or at stated times, as what is supernatural or miraculous does to effect it for once."

BUTLER: *Analogy of Revealed Religion.*

"To conclude, therefore, let no man out of a weak conceit of sobriety, or an ill-applied moderation, think or maintain, that a man can search too far or be too well studied in the book of God's word, or in the book of God's works; divinity or philosophy; but rather let men endeavour an endless progress or proficience in both."

BACON: *Advancement of Learning.*

Down, Beckenham, Kent,
First Edition, November 24th, 1859.
Sixth Edition, Jan. 1872.

THE

ORIGIN OF SP

BY MEANS OF NATURAL SE

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES I
FOR LIFE.

BY CHARLES DARWIN, M.A., LI

SIXTH EDITION, WITH ADDITIONS AND CORRE

(TWENTY-FOURTH THOUSAN

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARL
1882.

The right of Translation is reserved

২. নৃকেন্দ্রিকতা(Anthropocentrism)এবং মানবিক মূল্য

এখানে আমি এই দুটি দৃষ্টিকোণের বৈপরীত্য আলোচনা করব। অতি সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও আমি প্রথমটিকে বলব "প্রজাতির গুণভিত্তিক" দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয়টিকে বলব "জীবনমান ভিত্তিক" দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম – অর্থাৎ ডারউইনীয় প্রেক্ষিতগুলি তার আধুনিক চেহারায় জিনোটাইপের গুণমানগত দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেত, কারণ, যে বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বাচিত এবং পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয় সে সবই জিনঘটিত বৈশিষ্ট্য। 'জেনোটাইপ' শব্দটি আরো যথার্থ হলেও আমি ডারউইনের পরিভাষা মেনে 'প্রজাতি' শব্দটাই ব্যবহার করব। আসলে এই নিবন্ধের যা প্রতিপাদ্য সেখানে ঐ শব্দদুটির স্বাতন্ত্রের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।

জীবনমান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অবশ্য নৃকেন্দ্রিকতাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মানুষের জীবনমান যেভাবে বিচার করা যায়, অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা করা যায় না। এর আর একটা কারণ, "বিচার করা" এই অনুশীলনটা কেবল মানব প্রজাতিরই বৈশিষ্ট্য। এ সবই বাস্তব সমস্যা। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে এর ফলে জীবনমানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে প্রজাতির গুণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির জোর বেড়ে যাচ্ছে। বাস্তব ছবিটা অবশ্য আরো জটিল। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটাই মানবীয় মূল্যায়নের কাঠামোকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না । এমন কি প্রজাতি বা জেনোটাইপের মূল্যায়নেও – যেমন, কোন রূপটি সর্বোত্তম ও সবথেকে চমৎকার তা নির্ণয় করতেও – আমাদের নিজস্ব বিচারশীলতা কাজ করে। এই বিচারশীলতাকে অবশ্য আপাত পক্ষপাতহীন প্রজননগত সাফল্যের মাপকাঠি – প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতিকে হারিয়ে দেবার সামর্থের মাপকাঠি দিয়ে – প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। বস্তুত বিবর্তনমূলক প্রয়োগভাবনাতেও এই আপাত গুরুতর মানদণ্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আমি এই মানদণ্ডটির ধর্ম ও ব্যবহারের অনুপুঙ্খ আলোচনা করব। সেই সূত্রে কেন এই পরীক্ষাটি সুসংগত ও সুসমঞ্জস করে তোলা কঠিন তা আলোচনা করব। আমরা আলোচনা করব অন্তর্নিহিত সমস্যার কথা। অগ্রগতির মূল্যায়নে প্রজননগত সাফল্যকে কেন প্রাথমিক গুরুত্ব দিতে হবে সেই প্রশ্নটি থেকে এ সমস্যাটা আলাদা।

৩. প্রজাতি, সংরক্ষণ ও প্রাণীর জীবন

জীবনমানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনযাপনের মানের উপর মনোনিবেশ করে। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব বহু বিচিত্র প্রজাতি ও জেনোটাইপের কথা বলে। সুতরাং এমন যুক্তি হয়তো দেখানোই যায় যে ডারউইনের তত্ত্বের ব্যাপকতা জীবনমান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে অনেক বেশী। যেমন, বিপন্ন প্রজাতিগুলির সংরক্ষণের বিষয়ে পরিবেশবিদদের চিন্তাভাবনা বোঝার জন্য জীবনমান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে ডারউইনের প্রজাতি-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশী কার্যকর মনে হতে পারে। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন জীবপ্রজাতি কেন বিপন্ন হচ্ছে সে বিষয়ে পরিবেশগত কারণগুলির চর্চা সারা পৃথিবীর নজর কেড়েছে; এ নিয়ে ১৯৯২ –এর 'আর্থ সামিট' সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের বস্তুত 'নির্বাচিত বিলুপ্তি'-র (selected extinction) মাধ্যমে উন্নততর প্রজাতিকে বেছে নেওয়া এবং সে বিচারে বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণের পরিবেশতত্ত্বগত ধারণাটাই অ-ডারউইনীয়। অরিজিন এর একটা কৌতূহলোদ্দীপক ও জোরালো প্রতিপাদ্য হলঃ আমরা যাকে বিশ্বপ্রকৃতির জন্য সৃষ্টিকর্তা বানানো নিয়ম বলে জানি, এ তত্ত্ব সেই সুরেই বাজে। সে নিয়ম বলে পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান বাসিন্দাদের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি হয়েছে গৌণ, ব্যাখ্যাতীত কোনো কারণে। ডারউইনের দাবী, ক্রমাগ্রসরণের প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যারা টিকে আছে, তারাই 'উন্নততর'। বিলুপ্তি বিবর্তনমূলক নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার বিরোধী যে কোনো তত্ত্বকেই সমর্থন খুঁজতে হবে অন্য কোথাও।

উল্টোদিকে, পরিবেশতাত্ত্বিকেরা বরং সাহায্য পেতে পারেন উল্টোদিকের জীবনমান-নির্ভর প্রয়োগভাবনা থেকে। আমাদের পৃথিবীতে প্রজাতির বৈচিত্র্যকে যাপিত জীবনমান বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে দেখা যায়। আর বড়ো কথা হলো, মানুষ যদি যে-সব প্রজাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাদের এবং যারা সেই অর্থে 'অযোগ্য' এবং 'অ-নির্বাচিত' তাদের টিকে থাকার যুক্তিসংগত মূল্যায়ন করতে পারে এবং করে, তাহলে কী দাঁড়ায় ? সেক্ষেত্রে – ডারউইনের যোগ্যতমের উদবর্তনের ভিত্তিতে প্রগতির তত্ত্বের তুলনায় – মানবীয় যুক্তিক্রম দিয়েই পরিবেশ তাত্ত্বিকদের প্রশ্নগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া সম্ভব।

তাছাড়া, জীবনমানের প্রতি সাধারণ আগ্রহ প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা' যেমন একটি প্রাণীকে অন্ধকার দমচাপা বাক্সে আটকে রাখা, যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগ করতে দেখলেও উদাসীন থাকা ইত্যাদির মতো বিষয়ে আমাদের নজর টেনে নিয়ে যেতে পারে, ডারউইনীয় প্রেক্ষিত যা করবে না। বিকল্প মূল্যায়ন বাদ দিলে এ বিশ্ব হৃদয়হীন জড়পিণ্ড এবং জীবকুলের জীবনমান বিষয়ে কিছুটা সংবেদনশীলতাই কিন্তু আমাদের বিকল্প মূল্যায়নের ভাবনায় মৌলিক বদল এনে দিতে পারে।

৪. মানদণ্ড ও তুলনা

প্রগতি সংক্রান্ত ডারউইনীয় প্রয়োগভাবনা কীভাবে কাজ করে ? প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে অগ্রগতির বিচার করার সাধারণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? আমাদের পৃথিবীতে বিবর্তনমূলক প্রগতি নিয়ে ডারউইনের যে দাবী, তার মূল্যায়নের ভিত্তি কী ? প্রাণীজগতের ইতিহাসে দীর্ঘকালে অভিগমন ঘটেছে, এই দাবির যৌক্তিকতা আছে। আদিমতর স্তর থেকে কীভাবে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে সে ব্যাখ্যারও যুক্তি আছে। আর একটা কথা, আধুনিক মানবের মননশীল ও সংস্কৃতিবান রুচি এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে আদিম প্রাণী ও জীবকুলের বৈপরীত্য চরম – এককোষী প্রোটোজোয়ার কথা না হয় বাদই দেওয়া হল। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে কোটি-কোটি আমিবা আর ক্যাম্ব্রিয়ান মোলাস্কা বা ট্রাইবোলাইট পিঠে নিয়ে সূর্যকে পাক দিয়ে ঘুরে চলা

নির্বাক গ্রহটির তুলনা করে কেউ যদি প্রগতির গৌরব বোধ করেন সে কাজটিকে আদৌ বন্য পাগলামি বলা চলবে না।

কিন্তু ঐ বিশ্বাসটিকে পোক্ত করার জন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন দুটি বিবর্তনের মাধ্যমে প্রগতির প্রকৃতি সম্পর্কেঃ এ প্রগতি মাপা হচ্ছে ১) কোন মানদণ্ডে এবং ২) কার তুলনায় ? আমি একে একে প্রশ্নগুলি আলোচনা করব। ডারউইন এই মানদণ্ড চয়ন করেন কার্যত দুটি ধাপে – একটি অন্যটির তুলনায় স্পষ্টতর। প্রথম ধাপটি উৎপন্ন প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে প্রগতির বিচার করা। এটিই প্রগতি সংক্রান্ত ডারউইনীয় তত্ত্বের ভিত্তি। এই নিরিখটি, আমি আগে যা বলেছি, ডারউইনের সেই 'শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি যা আমরা কল্পনা করতে পারি' তার সঙ্গে, অর্থাৎ কিনা 'সর্বোন্নত প্রজাতির প্রাণীর জন্মের ধারণা'র সঙ্গে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় এবং আরো সুনির্দিষ্ট ধাপটিকে আমরা ডারউইনের নিজের লেখার মধ্যে, প্রচ্ছন্ন নয়, স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। প্রজাতি (কিংবা জেনোটাইপের) উৎকর্ষ বিচার করতে হবে প্রজননগত সাফল্যের নিরিখে – টিকে থাকা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমষ্টিগতভাবে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে (অন্য প্রজাতি, অন্য জেনোটাইপকে) হারিয়ে দেওয়া এবং বিনাশের ক্ষমতার নিরিখে। সাফল্যের এই জটিল সমবায়টির পারিভাষিক নাম 'যোগ্যতা' (fitness)। এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি হল টিকে থাকার ও প্রজননের সাফল্য। ডারউইনীয় তত্ত্বকাঠামোর কেন্দ্রে আছে 'যোগ্যতমের উদবর্তন'র তত্ত্বটি। যদিও ডারউইন নন, এই শব্দগুচ্ছটির উদ্‌গাতা হার্বার্ট স্পেন্সার, যা চার্লস ডারউইন পরমোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন। এবং এর ভিত্তিতেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের পরবর্তী প্রবক্তারা প্রগতি বা অগ্রগতি সংক্রান্ত দাবিগুলি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচনে যে যোগ্যতার বড় ভূমিকা আছে এমন স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী। প্রশ্ন হল, নির্বাচিত প্রজাতির যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রগতির মাপটা যুক্তিসংগত কি না। মানদণ্ড হিসেবে এটি আপাত দৃষ্টিতে স্বচ্ছ, কিন্তু অকাট্য ও বিশ্বাসযোগ্য কি ? আর তাছাড়া, এটা আদৌ স্বচ্ছ কি ?

৫. যোগ্যতাঃ সামঞ্জস্য ও যুক্তির অকাট্যতা

বিবর্তনবাদী চর্চায় যোগ্যতার মানদণ্ডটি ব্যাপকভাবে, উচ্চাশার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবশ্রেষ্ঠতার (optimality) ধারণাটি আবার উঠে এসেছে তুলনামূলক যোগ্যতার চর্চা থেকে। যোগ্যতার নিরিখে, একটি প্রজাতি বা জেনোটাইপ কেবলমাত্র তখনি সম্ভবশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে যখন সে তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকেই পরাস্ত করে। এই মানদণ্ডের একটি অসুবিধা হল এই যে, একজোড়া পরস্পর-বিকল্প প্রজাতির তুলনামূলক যোগ্যতা নির্ভর করে কোন পরিবেশগত সংস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা টিকে থাকার লড়াই করছে, তার ওপর। জেনোটাইপ

‘এক্স’ যদি ‘ক’ পরিবেশে জেনোটাইপ ‘ওয়াই’ এর থেকে যোগ্যতর হয়, তবে অন্য একটি পরিবেশ – ধরা যাক –‘খ’ সেখানেও, তাই ঘটবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং পরিবেশ – নিরপেক্ষ অবস্থায় দুটি বিকল্প প্রজাতির মধ্যে সবসময় একটির ওপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব নাও থাকতে পারে। অবশ্য এমনও হতেই পারে যে, একটি বিকল্প প্রজাতির সবরকম পরিবেশগত সংস্থানেই অন্য বিকল্প প্রজাতিটির তুলনায় নিকৃষ্ট এবং সেক্ষেত্রে ‘দক্ষ’ সম্ভাবনার গুচ্ছ (set) থেকে ঐ বিকল্পটিকে বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু, যদি এমনটা ঘটে যে, ‘দক্ষ’ বিকল্পগুলির মধ্যে তুলনাই করা যাচ্ছে না, একটি বিকল্প কিছু পরিবেশে শ্রেষ্ঠতর এবং অন্য কিছু পরিবেশে নিকৃষ্টতর হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সাপেক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রমিক অবস্থানে বসানো যাবে না।

সামাজিক চয়ন তত্ত্বের মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে – যেখানে উল্লিখিত ধরণের বিষমতা আছে – সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গাণিতিক যুক্তিক্রম ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ প্রজাতি চয়নের জন্য বিবর্তনবাদী চর্চায় ইদানিং বহুল ব্যবহৃত সম্ভবশ্রেষ্ঠতার পদ্ধতির বদলে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। বলা দরকার, গাণিতিক পদ্ধতি এই ধরণের অসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রেও সমাধান দেয়। সম্ভাব্য ক্রমান্বয়হীনতার (intransitivity) কোথাও মনে রাখতে হবে – ‘এক্স’, ‘ওয়াই’-কে পরাস্ত করল, ‘ওয়াই’, ‘জেড’–কে কিন্তু তার থেকে এটা নিশ্চিত হল না যে ‘এক্স’, ‘জেড’-কেও হারিয়ে দেবে। প্রজাতি বা জেনোটাইপের অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী যখন একই সঙ্গে থাকে, তখন টিকে থাকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পর নির্ভরতাও দেখা যায়। সুতরাং ক্রমান্বয়হীনতার এবং অসম্পূর্ণতার উদাহরণ যে তৈরি হবে, এমন সম্ভাবনাও জোরদার।

যোগ্যতার মানদণ্ডের কয়েকটি দিক আছে যেগুলি পরিপাটি হলেও বিভ্রান্তিকর এবং সেগুলোকে সরিয়ে দিলে মানদণ্ডটি আরো সুসমঞ্জস ও সুসংগত হয়ে ওঠে। তখন ঐ মানদণ্ডের নিরিখে অগ্রগতির যে ছবি ফুটে উঠবে তাতে কিছু ‘ছিদ্র’ এবং ‘ফাঁক’ থাকবে। কিন্তু তা আর ‘যোগ্যতার ক্রমাঙ্কনের পরিবেশ-নিরপেক্ষতা’, কিংবা, ‘একজোড়া প্রজাতির সরল তুলনার অপর্যাপ্ততা’-র মতো যুক্তিহীন পূর্বানুমানের দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। প্রগতি মাপার উপযুক্ত মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া কত কঠিন তা মনে রাখলে, এই মূল্য তো দেওয়াই যায়। কিন্তু প্রগতি মাপার পদ্ধতি হিসেবে যোগ্যতার ক্রমবৃদ্ধি যত ভালোই হোক না কেন, মানদণ্ডটির সরল ও পরিপাটি হওয়া আতে কিছু বাড়তি যোগ করে না। তবে প্রগতির মাপকাঠি হিসেবে যোগ্যতার ব্যবহার করার গভীরতর অসুবিধাটি অন্যত্র। সবথেকে মৌলিক প্রশ্নটি হলঃ কেন ? প্রজনন ও টিকে থাকাকে সাফল্যের মাপকাঠি কেন ধরা হবে ? কিন্তু এই প্রশ্নটি নিয়ে আরো এগোবার আগে, আমাকে বিবর্তনমূলক অগ্রগতির দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে। সে প্রশ্নটি হল, কার তুলনায় প্রগতি ?

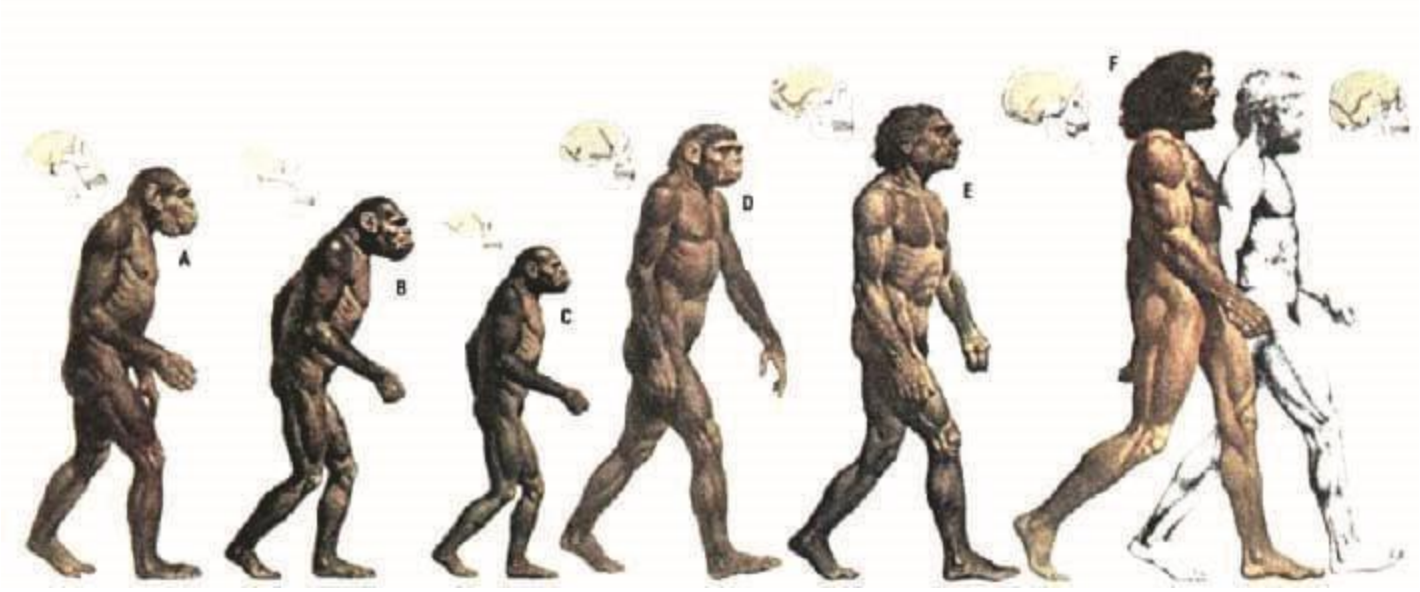

৬. কার তুলনায় যোগ্য ?

প্রজননগত সাফল্যের তুলনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতি বা জেনোটাইপগুলিকে চিহ্নিত করার দুটি ভিন্ন পথ আছে। একটি সময়ের সাপেক্ষে; অপরটি বিকল্প সম্ভাবনাসমূহের নিরিখে। প্রথমটিতে, প্রতিটি কালপর্বে যে প্রজাতি বা জেনোটাইপগুলি দেখা যায় তাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী কালপর্বের প্রজাতি বা জেনোটাইপের তুলনা করা হয়। কিন্তু দুটি কালপর্বের পরিবেশগত সংস্থান যেহেতু আলাদা, বিজয়ী প্রজাতির ঐতিহাসিক সাফল্য থেকে যোগ্যতার সাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আমরা খুব একটা কিছু জানতে পারি না। ধরে নেওয়া যায়, একটি কালপর্বে যে প্রজাতিটির প্রগতি ঘটল, পরিবেশগত সংস্থান থেকে সেটি কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা পেয়েছে। প্রতিটি কালপর্বের জন্যই এটা সত্য। কিন্তু, এই যুক্তিক্রম ধরে সময়ের সাপেক্ষে সাধারণ প্রগতির বিষয়ে কিছু বলা যায় না; এবং স্থানীয় পরিবেশের সুবিধা না পেলে প্রগতির চেহারা কেমন হত, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'-র মাধ্যমেই ত্রুটিহীন উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হয় – ডারউইনের এই তত্ত্বটি টিকে থাকা কঠিন; এমনকি প্রগতিকে যখন পুরোপুরি ডারউইন-বর্ণিত যোগ্যতার মাপকাঠিতে দেখা হয়, তখনও।

যোগ্যতার সাধারণ মাপকাঠির বদলে যদি আমরা যান্ত্রিক দক্ষতার মতো কিছু সহজবোধ্য দৈহিক গুণের মাপকাঠি নিই, তাহলে বরং ডারউইনের পথে কিছুদূর এগোনো যায়। বস্তুত জুলিয়ান হাক্সলে সময়ের সাপেক্ষে প্রগতি মাপার জন্য যান্ত্রিক দক্ষতার মানদণ্ডই ব্যবহার করেছেন[১] । যেমন, তিনি ঘোড়ার গতি এবং দাঁত দিয়ে চেবানোর ক্ষমতার দীর্ঘকালীন উন্নতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে এ ধরণের যুক্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে জিরাট ভারমেজি প্রস্তাব করেছেন যে, টিকে থাকার এই প্রকৌশলগুলির দীর্ঘকালে বিপুল উন্নতি হয়েছে[২] । ফলে হাল আমলের জীবসত্তাগুলি আগে যে পরিচিত পরিবেশে বাস করতে

অভ্যস্ত ছিল তার বাইরেও বহু বিচিত্র পরিবেশগত অবস্থাতে চমৎকার মানিয়ে নিতে পারছে। ভারমেজি তাঁর সিদ্ধান্তে এর কার্যকারণগত সম্পর্ক খুঁজছেন, বলেছেন, "দীর্ঘকালে একটি বসতি সংস্থানের প্রাণী ও উদ্ভিদ সমষ্টির পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরো কঠোর হয়েছে।"
পরীক্ষালব্ধ এইসব ফলাফল খুবই আলোকসম্পাতি, প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বিবর্তনমূলক প্রগতি বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি তো আর আনুমানিক হতে পারে না। যে প্রজাতি কঠোরতর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় টিকে থাকে, এবং অন্যদের তুলনায় উন্নতমানের প্রজনন করে, সেটি যে তুলনায় কম কঠোর একটি পরিবেশেও কিংবা আরো খারাপ কোনও পরিবেশেও একইরকম ভালো ফল করত, তা নাও হতে পারে। সময়ের সাপেক্ষে বিবর্তনমূলক প্রগতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বের কঠোরতা বাড়ে এই স্বতঃসিদ্ধের জোরে, পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে যোগ্যতার পরিবর্তনশীলতার সমস্যা পুরোপুরি দূর করা যাবে না।

সময়ের সাপেক্ষে তুলনা করে বিবর্তনমূলক প্রগতির বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আরো একটি মৌলিক সমস্যা আছেঃ কোনটাকে বিবর্তন বলব, আর কোনটাকে বলব না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা যা উন্নতি ঘটে তার সবকিছুকেই বিবর্তন বলে চালিয়ে দেওয়া অবশ্যই অযৌক্তিক। বিশেষত, ক্ষণস্থায়ী প্রাকৃতিক ঘটনার কারণেও কিছু পরিবর্তন হতে পারে। বিবর্তন তার নিজের পথে ডাইনোসরের অবলুপ্তির কারণ হয় নি। বা যে পথে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবপ্রজাতির জন্ম হয়েছে সেই সূত্রে জীবজগতের পরিবর্তনের নতুন পথ খুলে দেয় নি। সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে ডাইনোসরের বিনাশ ঘটিয়েছিল এবং আমাদের মানবপ্রজাতির বিবর্তনে সাহায্য করেছিল – যদি ঘটনাক্রমটা ঠিক এরকমই হয়, তবে আমাদের কাছে সে গ্রহাণুটির ধন্যবাদ পাওনা আছে। ডাইনোসরের ব্যাপারটা ছেড়ে আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুক্তি দেখাই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি ঘটেছে, তাহলেও বিবর্তনই যে এই প্রগতিশীল পরিবর্তন এসেছে এমন সিদ্ধান্ত পৌঁছানো যায় না।

এসবই, সময়ের সাপেক্ষে প্রগতির পরিবর্তে, প্রগতির কী কী বিকল্প সম্ভাবনা ছিল সেদিকে আমাদের নজর নিয়ে যায়। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে আমাদের নজর পড়ে যে সব প্রজাতির উদ্ভবই হয় নি, কিংবা উদ্ভুত হয়েও যারা অবলুপ্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে, যে সব প্রজাতি জন্ম নিয়েছে এবং টিকে থেকেছে সেগুলির তুলনার ওপর। যারা বিজয়ী হল, টিকে থাকল, তারাই যে ঐ পরিবেশের 'সম্ভবশ্রেষ্ঠ' প্রজাতি এমন কথা বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত ?

এত সহজে এমন কথা বলা যায় না। যে যোগ্যতমের কথা ডারউইন বা স্পেন্সার বলেছেন এমনটা হতেই পারে স্থানীয় যেসব প্রজাতিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে – সেটিই সেরা ছিল। হয়তো আরো বহু কারণ-নিয়মানুগ পথে কিংবা দুর্ঘটনার বলে – অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভবে বাধা দিয়েছিল। বিবর্তনমূলক জীববিদ্যায় চর্চিত উন্নয়নজনিত বাধা (developmental constraints) সম্ভবশ্রেষ্ঠতার ধারণাকে জটিল করে, তার জোর কমিয়ে দেয়[৩] ।

বিদ্যমান জীবসত্তার বৈচিত্র্যের পাশাপাশি, জগৎ ইতিহাসের বিকল্প একটি পরিস্থিতির কথা ভাবা যাক। অন্যরকম উন্নয়নজনিত বাধার মধ্যে, প্রকৃতির লটারির একেবারে অন্য একটা খেলাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে জীবসত্তারা উঠে আসতে পারত, তাদেরও যদি বিবেচনাতে রাখি, তখন সমস্যাটা আরো জটিল হয়ে ওঠে। গিলগামেস, বা অর্জুন, বা অ্যাকিলিসের মতো অতিমানবিক ক্ষমতাধর যে মহাকাব্যিক নায়কেরা ঐ কাল্পনিক জগতে উত্তেজনার রসদ জুগিয়েছেন (সে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ সবসময় শান্তিপূর্ণ ছিল তা নয়), তাঁদের চরিত্রচিত্রণ হয়তো সম্ভবই হত না। কিন্তু, যে পরিবেশে আমরা নিজেদের দেখেছি, সেই পরিবেশেই বিকল্প কোনো সম্ভাবনার ফল হিসেবে আমরা যে আরো যোগ্যতর প্রাণী হিসেবে অবতীর্ণ হতাম না, এই সম্ভাবনাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতির চাপে ও ঘটনাচক্রে, এমন আরো কত বিকল্প সম্ভাবনাই তো তৈরি হতে পারত। ভলতেয়ার 'কাঁদিদ'-এ যেমনটা বলেছিলেন "সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠতম বিশ্বে সবকিছুই শ্রেষ্ঠতমদের জন্য" – এই ঘোষণার প্রতিতুলনা যদি বিবর্তনবাদে খুঁজতে হয়, তাহলে কী কী বিষয়কে সম্ভাব্য বলে ধরতে হবে তা স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা দরকার।

সুতরাং বিবর্তনমূলক প্রগতির 'সম্ভাব্য বিকল্পসহ' সংস্করণটি, খুঁটিয়ে দেখলে, খুব বেশী হলে একধরণের 'স্থানীয়' সম্ভবশ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারে। এই সাফল্য, খুব সীমিত বিকল্পের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সাফল্যও প্রগতি বিচারের প্রাথমিক মাপকাঠি হিসেবে বিবর্তনমূলক যোগ্যতার গ্রহণীয়তার ওপর নির্ভরশীল।

৭. কেন যোগ্যতা ?

একটি প্রজাতির টিকে থাকা ও সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা যে আছে তা স্পষ্ট। বস্তুত, সেতাই যোগ্যতার সংজ্ঞা। কিন্তু কেন যোগ্যতাকে প্রগতির মানদণ্ড গণ্য হবে ? টিকে থাকার সুযোগপ্রাধান্য (advantage) বহু ধরণের গুণাবলী থেকে আসতে পারে। কিন্তু সে সব গুণ জীবনকে আরো আনন্দদায়ক, স্বচ্ছন্দ, আরো চমৎকার করে তুলবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্যাট্রিক বেটসনের পেশ করা উদাহরণটাই দেখা যাক। তিনি দেখালেন, "যে সব বহুগামী স্তন্যপায়ী প্রজাতির পুরুষরা পছন্দের নারীকে অধিকার করার জন্য অন্য পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের শ্বদন্ত একগামী স্তন্যপায়ীদের থেকে অনেক বড় হয়।" এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাইছি না। যাঁদের দাঁত বড়, টিকে থাকা ও প্রজননে তারা সুযোগপ্রাধান্য বেশি পাবে তা ঠিকই, কিন্তু, কেউ নিশ্চয়ই এ কথা বলবেন না যাঁদের দাঁত বিশাল তারা স্বতঃই খুব সুন্দর – কিংবা, যে একগামী স্তন্যপায়ীদের দাঁত তেমন বড় নয় তারা ঐ দানবদন্তী ভ্রাতৃকূলকে হিংসে করবে।

চার্লস ডারউইন "প্রত্যেকের ভালো"-র সিদ্ধান্তটিকে দ্বিধাহীনভাবে পেশ করতে গিয়ে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে তত্ত্বভিত্তি হিসেবে সামনে রেখেছিলেন তা যে পর্যাপ্ত নয়, তাকে যে 'ত্রুটিহীন' প্রজাতির আবির্ভাবের পন্থা মনে করা যায় না, এটা বোঝা কঠিন নয়। এমন বহু গুণ ও সফলতাকে আমরা স্বীকৃতি দিই, যা টিকে থাকার সহায়ক নয়, তবুও সেগুলির মূল্য আছে। অন্যদিকে, বহু কিছু আছে যা আমাদের কাছে আপত্তিকর, কিন্তু যার ওপর টিকে থাকা নির্ভর করে। যেমন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী একটি গোষ্ঠী যদি হোমো স্যাপিয়েন্স-এর রকমফের ভূমিদাস প্রজাতিটিকে অমানবিক অবস্থাতে থাকতে বাধ্য করে এবং ঐ প্রজাতিটি যদি অত্যন্ত কার্যকর ব্যবহারোপযোগী দাস প্রজাতি হিসাবে – দাঁত কামড়ে টিকে থাকার উপযোগী, অতি দ্রুত প্রজননকারী প্রজাতি হিসাবে মানিয়ে নেয় ও বিবর্তিত হয়, আমরা কি তা প্রগতির নজির হিসেবে নেব ? ঠিক এর সদৃশই তো সেই প্রাণীদের উদাহরণ যারা আমাদের খাদ্য। কিন্তু মানব প্রজাতির কাছে এই বন্দোবস্ত আদৌ গ্রহণীয় নয়। এবং যেমনটা আমরা আগে যুক্তি দেখিয়েছি, প্রাণীকুলের জন্যও এই বন্দোবস্ত গ্রহণীয় কী না, তা-ও স্পষ্ট নয়।

৮. মূল্যায়ন যুক্তিশীলতা

প্রগতির মাপকাঠি বাছতে হলে আমাদের যুক্তিশীল মূল্যায়নের পথে যেতে হবে। এ-কাজ মোটেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিচারের ক্ষমতাই বা কতদূর জোরালো ও নির্ভরযোগ্য ? যে মূল্যবোধেরই আমরা সমর্থন করি না কেন, বিবর্তনের পথে আমাদের বিচারশীলতার যত উন্নতিই হোক না কেন, এই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক থাকবে। এর থেকে কেউ এমন যুক্তি দেখাতে পারেন যে, আমাদের বিচারক্ষমতাও নির্বাচিত হয়েছে উদবর্তন ও প্রজননের সুযোগপ্রাধান্য দেওয়ার জন্যই, এবং অন্য কোনো কারণে তার ব্যবহার প্রশ্নাতীত। অপর একজন আবার বলতে পারেন যেহেতু আমরাও বিবর্তনের ফসল, আমাদের যুক্তিশীল বিচারক্ষমতার নির্বাচনের সময় বিরুদ্ধ উপাদানগুলিকে এমনভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা বিবর্তনবাদের সাফল্যের তত্ত্বটিকেই মেনে নিই। এইসব যুক্তি কি আমাদের যুক্তিশীল মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতাকে খর্ব করে ? আমি মনে করি, করে না।

আমাদের যুক্তিশীলতার উদ্ভব যেহেতু বিবর্তনের পথে টিকে থাকার সুযোগপ্রাধান্যের মধ্য দিয়ে হয়েছে, ফলে কেবলমাত্র সে কাজেই তা ব্যবহার করা যাবে এমন তর্ক অর্থহীন। আমাদের চিত্তবৃত্তি কখনোই একটি মাত্র কাজের জন্য বাধা থাকে না। আমাদের বর্ণচেতনা হয়তো শিকার খুঁজে বার করতে কিংবা হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে আমাদের টিকে থাকার সহায়ক হয়েছে। তা বলে আমরা পিকাসোর বা সেজানের ছবির বর্ণময়তায় মুগ্ধ হবো না, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আমাদের যুক্তিশীলতা যে প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়ে থাক না কেন, আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো তাকে ব্যবহার করতে পারি; তার সাহায্যে প্রগতির মাপকাঠি হিসেবে উদবর্তনের সুযোগ প্রাধান্যের বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি।

অন্য আপত্তিটা এতটা জোরালো নয়। ভিন্ন অবস্থায় বাস করা, কিংবা সম্ভাব্য অন্য কোনো বিশ্বের বাসিন্দা প্রাণীদের তুলনায় আমরা এই বিশ্বকে বেশি পছন্দ করবো, এমনটা মনে করার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ঐ সত্য আমাদের মূল্যবোধকে খর্ব করে না। আরো চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটি হলো, চেনা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আন্তঃসম্পর্ক তার জন্য কি আমরা এ পৃথিবীর সব কিছুকেই অনুমোদন দিই, সব কিছুকেই বিনা সমালোচনায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফসল হিসেবে মেনে নিই। আমরা যে এমনটা করি তার কোনো নজির কিন্তু নেই। যেমন, ব্যথা আমাদের একটা সংকেত পাঠায় যা টিকে থাকার লড়াইতে খুব সাহায্য করে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, যন্ত্রণা খুব ভালো কিছু। বস্তুত, যে সব ক্ষেত্রে যন্ত্রণার প্রণোদনমূলক ব্যবস্থা হতে পারে, তেমনি খুড়োর কলও প্রণোদনের কাজ করতে পারে। সংকেত পাঠানো এবং প্রণোদনার ভিত্তিতে এই দুটি দিকের তুলনা করা হলে আমরা নিশ্চয়ই লাঠির বদলে খুড়োর কলকেই বেছে নেব।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ যখন আলোকপ্রাপ্তির জন্য রাজপুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তিনি তখন মানব-অস্তিত্বের দুর্দশা দেখে, জরা-বার্ধক্য, রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট এবং মৃত্যু দেখে বিচলিত। এইভাবে মানবজন্মের ঘরে আসার পরিণতিকে মেনে না নেওয়ার মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকার কারণ ছিল না। জীবনের জন্য প্রাণীহত্যা এবং জীবমাংস উদরপূর্তির নৃশংসতা নিয়ে বুদ্ধের সিদ্ধান্তেও কোনো অসংগতি ছিল না। অথচ তখনও প্রকৃতি একটি প্রজাতির স্বার্থে অপর একটির বিসর্জনকে সমর্থন করে এসেছে।

৯. ব্যক্তি ও গোষ্ঠী লক্ষণ

টিকে থাকা বা উদবর্তন ছাড়া আরো বহু বিষয় আছে যাকে আমরা মূল্য দিয়ে থাকি। বিবর্তনের তত্ত্ব চর্চায় এই অসুবিধাটি ছাড়া আরো সুনির্দিষ্ট সমস্যাও আছে। তার মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো, বিবর্তন একজন ব্যক্তির টিকে থাকা বা বেঁচে থাকা নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। অথচ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের

তো সে বিষয়ে কিছু আগ্রহ আছেই। যেন এটা বুঝেই, অরিজিন অব স্পিসিস প্রকাশের এক দশক আগে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন টেনিসন।

দেখতে সে তো এতই মনোযোগী

জীবন নিয়ে অথচ তার কাছে

মনোযোগের চিহ্ন মাত্র নেই

এর একটা কারণ হলো প্রজননক্ষম বয়স পার হয়ে গেলে প্রাকৃতিক নির্বাচন আর ব্যক্তির ভালমন্দ বা বেঁচে থাকা নিয়ে আগ্রহী থাকে না। আরো একটা কারণ হলো, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মানদণ্ডে মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার মতো বিষয়ও প্রজনন ক্ষমতার তুলনায় কম অগ্রাধিকার পেতে পারে। বিশেষত যদি প্রজনন ক্ষমতার জোরে প্রজাতির বা জেনোটাইপের সংখ্যা বৃদ্ধির হার, মৃত্যুহারকে অতিক্রম করে যায়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন দু'ভাবে ব্যক্তিজীবনের প্রতি উদাসীন হতে পারে। ব্যাক্তির আয়ুষ্কাল নিয়ে তা বিচলিত নয়, একেবারেই বিচলিত নয় জীবনকুশলতা নিয়ে। বস্তুত, প্রজননের ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগপ্রাধান্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত কোনো কিছুর দিকেই তার লক্ষ্য নেই।

১০. বংশগতির উন্নতি ও সুপ্রজননবিদ্যা

প্রগতির সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ডারউইনীয় পরিপ্রেক্ষিত এ কথাই বলে যে প্রজাতিগুলি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিক। প্রজাতিগুলি যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তেমনভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের কথা তা বলে না। ডারউইনীয় পরিপ্রেক্ষিতকে এভাবে দেখা অন্যায় হবে না। ফলে প্রগতির এই দৃষ্টিভঙ্গি যে এক বিশেষ ধরনের সচেতন পরিকল্পনাকে – বংশগতির উন্নতির বা জিনগত উন্নতির পরিকল্পনাকেই উৎসাহিত করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics) চর্চার আন্দোলন, গত শতকের শেষ দিকে যার উদ্ভব, তা ডারউইনীয় যোগ্যতমের উদ্বর্তনের যুক্তিক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুপ্রজননবিদ্যা, প্রকৃতি যাতে – 'অযোগ্য' প্রজাতির সংখ্যা কমিয়ে – উন্নততর প্রজাতি তৈরি করতে পারে তার জন্য 'সাহায্যের হাত' বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে। তার জন্য সচেতন করা থেকে শুরু করে বলপূর্বক নির্বীর্যকরণের নীতির প্রচারও করা হয়।

সুপ্রজনন বিদ্যাচর্চার বহু নামীদামী প্রবক্তা ছিলেন – ডারউইনের জাতিভাই স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন থেকে দার্শনিক নিৎসে-র বোন এলিজাবেথ নিৎসে পর্যন্ত। এই ধরনের জিনগত প্রকৌশলের পক্ষসমর্থন কিছুকালের

জন্য বেশ মর্যাদা পেয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তা দুর্নামের ভাগী হয় – বিশেষত, হিটলারের ভয়ংকর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। হিটলার আবার ঘটনাচক্রে এলিজাবেথ নিৎসের শেষকৃত্যে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। ডারউইন কখনই জিনগত উন্নয়নের পক্ষ নেন নি, কিন্তু প্রগতিকে প্রজাতির গুণ দিয়েই প্রাথমিকভাবে মাপতে হবে তার এই ভাবনার সঙ্গে সুপ্রজনন বিদ্যা সহজেই সহাবস্থান করতে পারে। যারা ডারউইনীয় প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণভাবে প্রগতি বোঝার পর্যাপ্ত তত্ত্ব হিসেবে দেখেন তাঁদের নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নততর জীবপ্রজাতি সৃষ্টির জিনগত প্রকৌশলের গ্রহণযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরও দিতে হবে। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রগতির এই পরিপ্রেক্ষিতকে সমঝোতায় আসতে হবে সেই বিরোধী মূল্যমানগুলির দাবীর সঙ্গে – স্বয়ংনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারের মতো যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া সংগত বলে আমরা মনে করছি।

১১.অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত

যদিও সুপ্রজননবিদ্যার আন্দোলন ডারউইনবাদ থেকে প্রোৎসাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সমর্থন পেয়েছিল, এ কথা বলতেই হবে যে প্রগতির বিষয়ে ডারউইনের দিশা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অভিসন্ধিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে ডারউইনবাদের সবথেকে বৈপ্লবিক দিক ছিল, কেউ সুপরিকল্পিতভাবে একই সঙ্গে সব প্রজাতির সৃষ্টি করেছেন – এই ধারণাকে অস্বীকার করা। স্বতস্ফূর্ত প্রগতির সাধারণ তত্ত্ব ঐশী-শক্তির ইচ্ছাসংক্রান্ত ধারণাকে ছাপিয়ে যায়। বিবর্তন যদি প্রগতি নিশ্চিত করে তবে জীবসংস্থানের অন্তর্গত শক্তির – মানবপ্রজাতির – সদিচ্ছামূলক প্রয়াসও সেই অনুপাতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, এমন যুক্তিও হাজির করা যায় যে, যে – বিশ্বে আমরা বাস করছি তাতে বদল আনার মাধ্যমে প্রগতির প্রয়াসও বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করতে পারে। আমরা যদি প্রগতি বিচারে প্রজাতির মান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি, এবং যদি আমরা মেনে নিই জিনগত নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিতে পারি, তবে – এ প্রশ্নও তো আসতে পারে – অযোগ্য জিনকে উৎসাহিত করে কী হবে ? স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতির তত্ত্ব এভাবে সৃষ্টিকর্তা খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের প্রয়াসকে অস্বীকার করে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুই অস্বীকার করে।

সুতরাং প্রগতির ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দুটি ভিন্ন অভিমুখে ঠেলে দিতে পারে। একটি জিনগত প্রকৌশলের কথা বলে, অন্যটি বলে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতি নিষ্ক্রিয় নির্ভরতার কথা। এ দু'য়ের মধ্যে সাধারণ বিষয়টি হল, নিঃসন্দেহে, বিশ্বকে আমাদের প্রয়োজনমতো বদলে নেবার প্রশ্নে নীরব থাকা। দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ফারাক এসেছে কেমন মানের জীবন বিভিন্ন জীব প্রজাতি যাপন করে তার ভিত্তিতে নয়, প্রজাতির বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রগতি বিচার করার সরাসরি ফল হিসাবে। জীবনযাপনের মানে নজর দিলে তাৎক্ষণিক চোখ পড়ত বাইরের পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় বদল আনার প্রয়োজনের ওপর। যদি ডারউইনীয় অবস্থান থেকে দেখা হয়,

তবে সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিটি জিনগত প্রকৌশলের দিকে এগোয়। আর নিষ্ক্রিয়তর দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখ থাকে প্রকৃতিকে বিশ্বাস করার দিকে। কোনোটাই বাইরের পৃথিবীর সংস্কারের অভিমুখে আমাদের চালিত করে না।

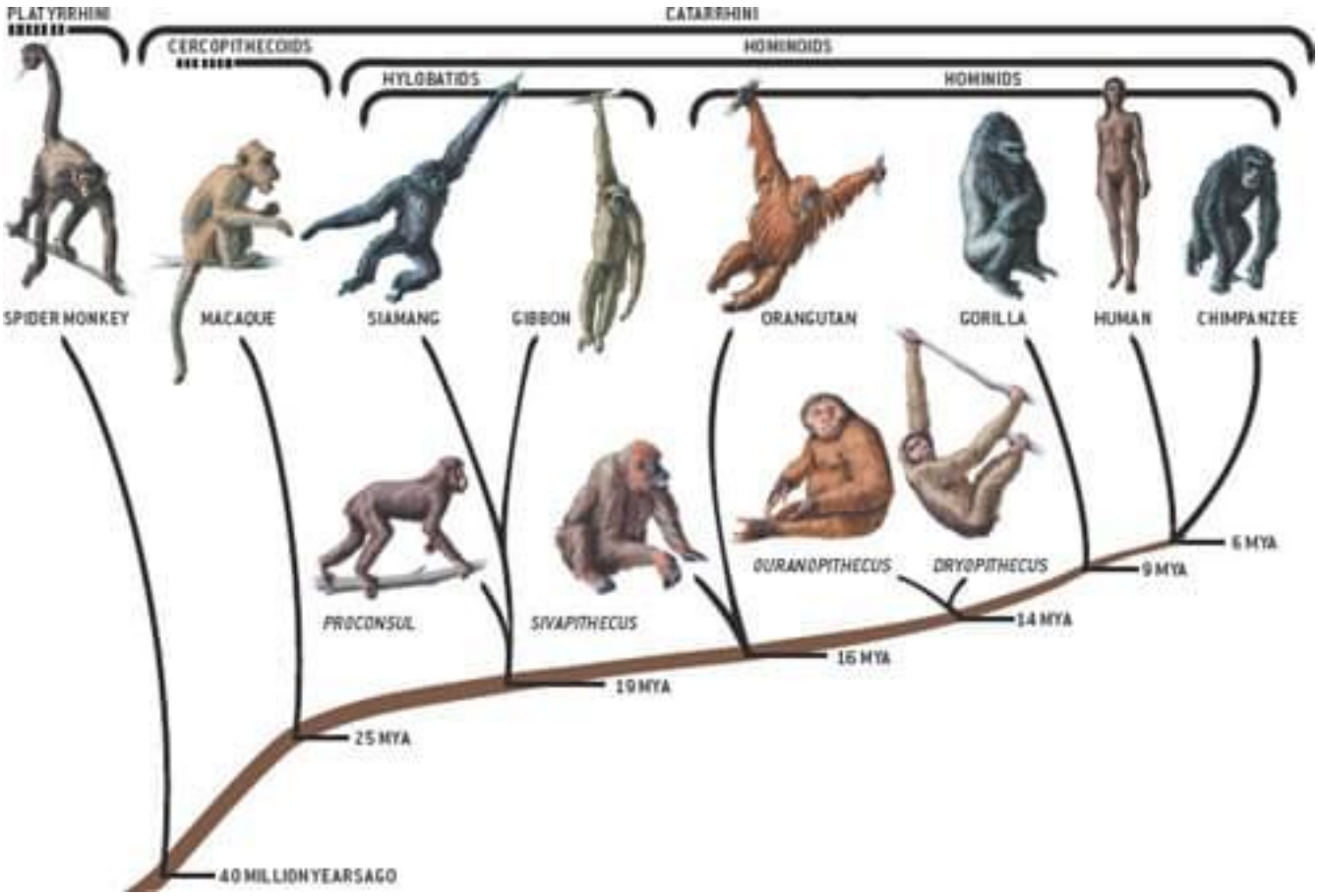

১২. ডারউইন ও ম্যালথাস

আলোচিত বিষয়টি আরো বড় একটি প্রশ্নের সঙ্গে যুক্তঃ একদিকে প্রকৃতির প্রতি আস্থা এবং অন্যদিকে প্রকৃতির অপ্রীতিকর প্রভাবগুলিকে সচেতনভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা – এ দুটির মনোভঙ্গিগত পার্থক্য। এই বৈপরীত্য বোঝার জন্য আমরা দুটো বিপরীত চিন্তার কথা বলতে পারিঃ প্রথমটা সামাজিক নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে ম্যালথাসের প্রকৃতির নিয়মের কথা মনে করিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়টা এর বিপরীতে গোল্ডউইনের সক্রিয় হস্তক্ষেপের তত্ত্ব[৫] । বস্তুত, ম্যালথাস ছিলেন বিবর্তন তত্ত্বের প্রকৃত গুরু। ডারউইন 'দি অরিজিন'–এ ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর তত্ত্ব অংশগত "ম্যালথাসেরই তত্ত্ব যা বহুগুণ জোরের সঙ্গে সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে"। ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'এসে অন পপুলেশন'-এ ম্যালথাস প্রাকৃতিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে প্রজাতির টিকে থাকার প্রশ্নটিকে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর কাজটির দার্শনিক অভিপ্রায় ছিল গোল্ডউইন ও কনদরসে-র বৈপ্লবিক প্রগতিশীল ভাবনার বিরোধিতা, গবেষণাপত্রের আখ্যাপত্রেও সে কথাই লেখা

হয়েছিল[৬] । কিন্তু উপলক্ষ্য ছিল গ্রেট ব্রিটেনের "পুয়োর ল"-এর বিধানে পরিবর্তন আনার – পরিবারের সদস্যসংখ্যার অনুপাতে কল্যাণমূলক অনুদান দেওয়ার – আইনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করা[৭] । ম্যালথাস মনে করেছিলেন প্রকৃতির নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হলে সমস্যা আরো জটিল হবে। সুতরাং, যাদের সাহায্য করা উচিত নয় তাদের সাহায্য করার সচেতন প্রয়াসটি পরিহার করাই ভালো।

খুব একটা আশার সঙ্গে না হলেও, ম্যালথাস, স্বেচ্ছা সংযমের পথে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবক্তা ছিলেন। সুপ্রজননবিদ্যার মতো এই ক্ষেত্রেও জোর ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে না বদলে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ওপর। ম্যালথাস দরিদ্রকে সাহায্য করার সরকারি কর্মসূচির, অবিবাহিত মায়েদের কিংবা পরিত্যক্ত শিশুদের হাসাপাতালের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনার তীব্র ও ধারাবাহিক বিরোধিতা করেছিলেন[৮] । বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্তদের প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের সাহায্য করার সরকারি উদ্যোগ – এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য সাম্প্রতিক বিশ্বেও সমান প্রাসঙ্গিক। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বের তাৎপর্য হয়তো ইদানিংকালে – বাজার অর্থনীতির মতো নৈব্যক্তিক শক্তিগুলিকে পথ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতার জন্য – আরো বেড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বের পতনকে হস্তক্ষেপের একটি বিশেষ পন্থার ব্যর্থতা হিসেবে নয়, দেখা হচ্ছে যে কোনোরকম পরিকল্পিত উন্নয়নের অসম্ভাব্যতা হিসেবে।

১৩. অবলুপ্তি এবং পরিবেশ

হস্তক্ষেপের প্রশ্নটা মূলত সামাজিক বিষয়গুলোর সঙ্গে (ম্যালথাস-গোল্ডউইন পার্থক্যের উদাহরণে যাদের কথা বলা হয়েছে), ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও, পরিবেশগত বিষয়গুলিও আছে। ওজোন স্তর নিঃশেষিত হওয়ার সমস্যাটার কথাই ধরা যাক। যদি কোনো হস্তক্ষেপ না করা হয়, তবে ওজোন স্তরের ক্ষয় জীবজগৎকে ভবিষ্যতে, বিবর্তনের পথে, জিনগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন, যে সব জেনোটাইপের বিপন্নতার মাত্রা কম, তারা হয়তো বিকিরণগত পরিবর্তনের সঙ্গে বেশি যুঝতে পারবে এবং ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যাই বাড়বে। (আমি শুনেছি, আমরা অশ্বেতাঙ্গরা নাকি তোমাদের মতো সাদাদের থেকে অনেক পরে ধবংস হবো, তবে এ ব্যাপারে আমি অবশ্য কোনো বাজি ধরছি না।)

প্রাকৃতিক নির্বাচন নাকি আমাদের সরিয়ে 'যোগ্যতর' মানবপ্রজাতিকে পৃথিবীতে আনবে, এই নাকি বিবর্তনের প্রগতিশীলতা। কিন্তু আমরা যদি জীবনকে মূল্য দিই, রোগবালাই আর বিলুপ্তিকে দোষারোপ করি তবে আমরা এমন পন্থার কথা ভাববো যা পরিবেশের অপ্রীতিকর পরিবর্তনগুলোকে সজোরে প্রতিরোধ করবে। মানবপ্রজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হয়, জিনগত প্রাকৃতিক নির্বাচন আনন্দদায়ক ভবিষ্যতের পরিবর্তে ভয়ংকর ভবিতব্যের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

এই বৈপরীত্যকে আমি খুব তীক্ষ্ণ বলছি না, কিন্তু প্রকৃতিকে, এবং বৃহত্তর অর্থে যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমরা বাস করি তাকে, দেখার ভিন্ন ভিন্ন পন্থার পিছনে মনোভঙ্গির বিপুল পার্থক্য আছে। এমন একটা দ্বিধার কথাই প্রিন্স অব ডেনমার্ক বলেছিলেনঃ

কোন পথ মহত্তর ?

ভয়াল ভাগ্যের লিপি

শিরোধার্য, অতএব

যন্ত্রণার বন্দীত্ব গ্রহণ ?

অথবা বিরুদ্ধ প্রতিরোধে

দুর্দশার পারাবার ভাঙা,

শেষ করা মানুষের দুর্ভাগ্যের যাবৎ কারণ ?

(শেক্সপিয়ারের অনুবাদ)

শেক্সপিয়ারের এই ভাবনা ডারউইনকে হয়তো তেমন নাড়া দেয়নি। কারণ তিনি কবির লেখা পড়তে শুরু করেছিলেন শেষ জীবনে এবং কবির রচনা তাঁর পছন্দ হয় নি। ডারউইন আত্মজীবনীতে লিখেছেন "আমি অনেক পরে শেক্সপিয়ার পড়ার চেষ্টা করলাম এবং দেখলাম লেখাগুলি এত অসহ্য রকমের পানসে যে আমার বমি আসছে"। সুতরাং আমিও শেক্সপিয়ারে জোর দেব না। কিছু এখানে এমন একটা কথা বলা হয়েছে যা, আমার মনে হয়, ডারউইনীয় বিবর্তনবাদীরা ভেবে দেখলে ভালো করবেন।

১৪. ডারউইনবাদ ও আমাদের জীবন

উপসংহারে বলতে হয়, ডারউইনের বিবর্তনমূলক প্রগতির বিশ্লেষণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা এবং 'সর্বোচ্চস্তরের প্রাণী' সহ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব দিয়ে বিবর্তনের মূল্যায়নের প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও, যা আমি এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি, 'যোগ্যতমের উদবর্তন' তত্ত্বের যোগ্যতার ধারণাটি আরো ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

ডারউইন প্রজাতির গুণগত মানের, এবং আরো নির্দিষ্টভাবে বললে টিকে থাকা প্রজাতিগুলির যোগ্যতার – ভিত্তিতে প্রগতি বিষয়টাকে পেশ করতে চেয়েছেন। এই প্রয়োগভাবনাতে জীবকুল কীভাবে জীবনযাপন করতে পারে তা না দেখে তাদের বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। ডারউইনের কাজের এই দিকটি, এবং তার প্রভাব, আরো বেশি সমালোচনার যোগ্য। মানবপ্রজাতি বা অন্য জীবপ্রজাতির জীবনযাপনের মানকে তা উপেক্ষা করে; যুক্তিসংগতভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং সেভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করার গুরুত্বকেও অস্বীকার করে। যে পৃথিবীতে আমাদের বসবাস, আমাদের উপযোগী করে তার পরিবর্তনের প্রশ্ন থেকে নজর সরিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে তা সুপ্রজননবিদ্যার আন্দোলনের মতো জিনগত কৌশলকে উৎসাহিত করে, অথবা, ডারউইনের ঘোষণার অনুসরণে স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতির ওপর নিষ্ক্রিয় নির্ভরতাকে প্রণোদিত করে। দুটি ক্ষেত্রের কোনোটিতেই পরিবর্তনসাধ্য পরিমণ্ডলের ওপর আমাদের জীবনযাপনের মান কীভাবে নির্ভরশীল সে আলোচনা গুরুত্ব পায় না।

প্রখ্যাত প্রাণী বিজ্ঞানী ও ডারউইনীয় তত্ত্ববিদ আর্নস্ট মায়ার দেখিয়েছেন ১৮৫৯ এর পরে, অর্থাৎ 'দি অরিজিন অব স্পিসিস' প্রকাশের পরে পাশ্চাত্যের যে কোনো মননশীল মানুষের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ডারউইন-পূর্বকালের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ন আলাদা না হয়ে পারে না[৯] । এ কথাটা সত্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু ডারউইনীয় অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ-নির্ভর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিও অতীব সীমাবদ্ধ হতে পারে, কারণ, তা জীবনের বদলে জোর দেয় বৈশিষ্ট্যে। বসবাসের পৃথিবীকে পালটাবার কথা না বলে, বলে মানিয়ে নেবার কথা।
সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষিতে এই সীমাবদ্ধতাগুলো খুবই জোরদার। বিশেষত যেখানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিঃস্বতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মতো প্রতিরোধসাধ্য বঞ্চনা আছে, আছে, পরিবেশের ক্ষয়, প্রজাতির বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা, প্রাণীদের প্রতি ধারাবাহিক নিষ্ঠুরতা এবং মানবপ্রজাতির বড় অংশের জন্য দুঃসহ জীবন। আমরা অবশ্যই ডারউইনকে চাই, তবে নির্বিচারে নয়।

রচনা প্রসঙ্গে

এই লেখাটির উৎস ১৯৯১ এর ২৯ শে নভেম্বর কেমব্রিজের ডারউইন কলেজে প্রদত্ত ভাষণ। সহায়ক আলোচনার জন্য আমি ওয়ালটার গিলবার্ট ডেভিড হেগ, আলবার্ট হার্সম্যান, রিচার্ড লিয়েনটিন, জিওফ্রে লয়েড, রবার্ট নজিক এবং এমা রথসচাইল্ডের কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন রিভিউ অব বুকস-এর ১৪ নং সংখ্যাতে (নভেম্বর ৫, ১৯৯২) বার্ষিক ডারউইন লেকচার, ১৯৯১ হিসেবে। পরে পুনপ্রকাশিত হয় পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ১৯৯৩ তে।

সূত্রঃ

১. জুলিয়ান হাক্সলি, ইভলিউশন ইন অ্যাকশন (নিউ ইয়র্ক হর্পার, ১৯৫৩)।

২. জিরাট ভারমেজি, ইভলিউশন অ্যান্ড এসক্যালেশন (প্রিন্সটন ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৮৭)

৩. বিরোধী মতের ধ্রুপদী আলোচনার জন্য দেখুন স্টিফেন জে. গোল্ড এবং রিচার্ড সি. লিওনটিন, "দি স্প্যানড্রেল অব সান মার্কো অ্যান্ড দি প্যংগ্লোসিয়ান প্যারাডাইসঃ এ ক্রিটিক অব দি অ্যাডাপটেশনিস্ট প্রোগ্রাম," যা প্রকাশিত হয়েছিল প্রসিডিংস অব রয়াল সোসাইটি অব লন্ডন, বি। ২০৫ (১৯৭৯) তে। আরো দেখতে পারেন জাঁ দুপ্রের দি লেটেস্ট অন দি বেস্টঃ এসেস অন ইভলিউশন অ্যান্ড অপটিম্যালিটি (কেমব্রিজ, ম্যাসচুসেটসঃ এম.আই.টি, প্রেস ১৯৮৭)।

৪. প্যাত্রিক বেটসন, " দি বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন অব ক-অপারেশন অ্যান্ড ট্রাস্ট", যা প্রকাশিত হয়েছিল দিয়েগো গ্যামবেত্তা (সম্পাদিত) ট্রাস্টঃ মেকিং অ্যান্ড ব্রেকিং কো-অপারেটিভ রিলেশ্নস (অক্সফোর্ডঃ ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৮৮)তে।

৫. মনোভঙ্গির এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্যের আলোকসম্পাতি বিশ্লেষণ করেছেন উলিয়াম সেন্ট ক্লেয়ার দি গডউইন্স অ্যান্ড দি শেলিসঃ এ বায়োগ্রাফি অব অ্যা ফ্যামিলি (লন্ডনঃ নর্টন, ১৯৮৯)-এ।

৬. নিবন্ধটির আদি আখ্যা ছিলঃ অ্যান এসে অন দি পিন্সিপল অব পপুলেশন অ্যাজ ইট আফেক্টস দি ফিউচার ইম্প্রুভমেন্ট অব সোসাইটি, উইথ রিমার্কস অন দি স্পেকুলেশনস অব মি, গডউইন, এম. কনদরচে অ্যান্ড আদার রাইটার্স (লন্ডন, ১৭৯৮)।

৭. দেখুন, জে. এল. ব্রুকস, জাস্ট বিফোর দি অরিজিন (নিউইয়র্কঃ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪)

৮. দেখুন, ব্রুকস (সূত্রঃ ৭) এবং সেন্ট ক্লেয়ার (সূত্রঃ ৫)

৯. আর্নস্ট মায়ার, ওয়ান লং আর্গুমেন্ট (কেমব্রিজ, ম্যাচাচুসেটসঃ হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১)।

ডারউইনের তত্ত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্যানসারচর্চা

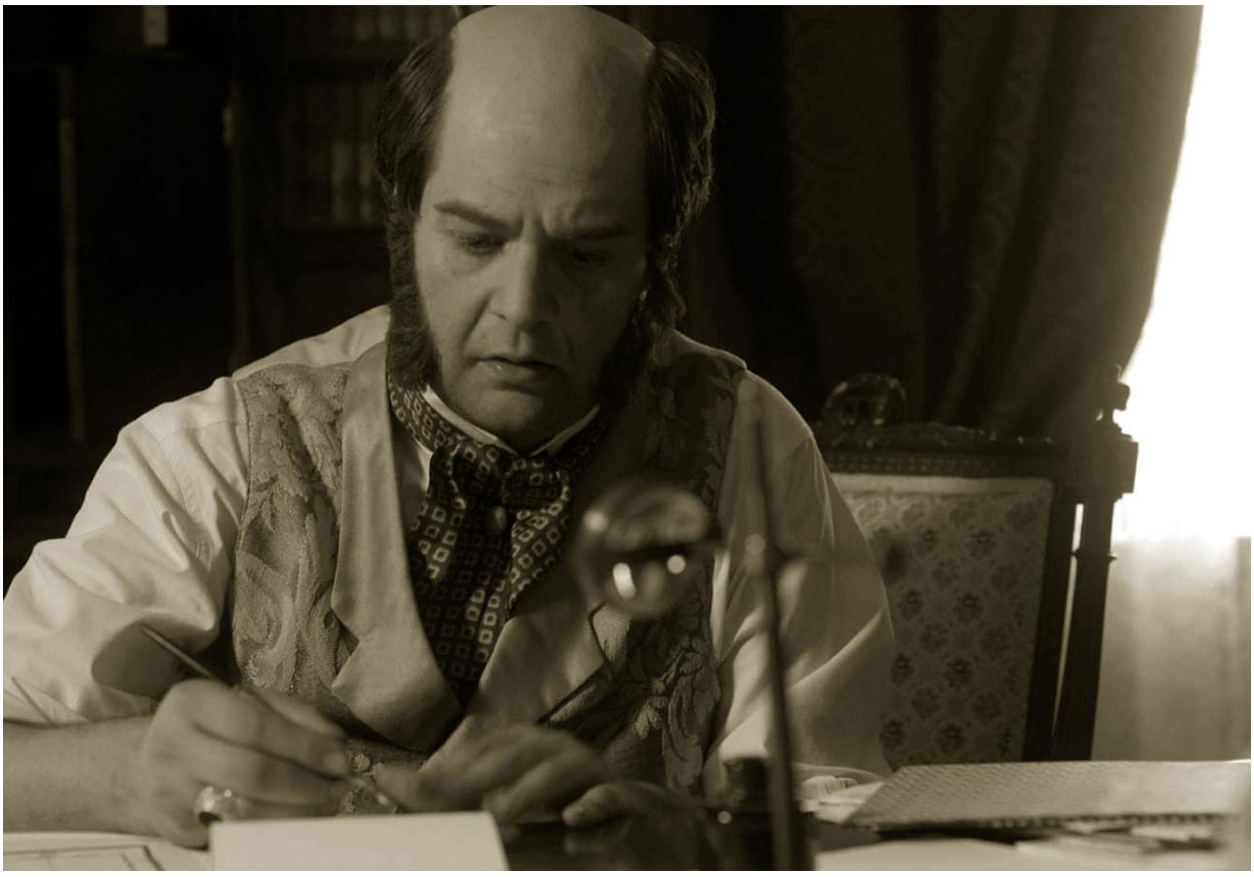

-স্থবির দাশগুপ্ত
বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং প্রাবন্ধিক

(২০০৯ সালে, ডারউইন-এর জন্মের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমার দু'টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, – একটি 'বারোমাস' ও অপরটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। এই দু'টি লেখাকে সংযুক্ত ও পরিমার্জিত করে বর্তমান লেখাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমার 'জীবন যাপন ও ক্যানসার' গ্রন্থে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। প্রকাশক 'ধানসিড়ি'।)

১

চার্লস ডারউইনকে জীব-বিবর্তনবাদের প্রবাদপুরুষ বলে গণ্য করা হয়। একথা ঠিকই যে 'অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন' (১৮৫৯) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল চার্লস ডারউইন-

এর নামেই। কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবের বিবর্তনের ধারণাটি ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটিতে তিনি একাই পরিবেশন করেননি; তাঁর সহযোগী ছিলেন রাসেল ওয়ালেস (১৮৩২-১৯১৩)।

অবশ্য শুধু ডারউইন বা ওয়ালেসই না, প্রজাতির সৃষ্টি আর বিবর্তন নিয়ে তাঁদের আগেও অনেকেই মাথা ঘামিয়েছিলেন। বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ভূস্তর আর শিলীভূত জীবাশ্ম ('ফসিল') নিয়ে নানান্ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তাঁরা বর্তমান প্রজাতির আদি রূপের কথা ভাবতে চাইছিলেন। জন রে (১৬২৭-১৭০৫), ক্যারোলাস লিনেয়াস (১৭০৭-৭৮), জি এল বুফোঁ (১৭০৭-৮৮) আর এরাস্মাস ডারউইন (১৭৩১-১৮০২)-এর মতো অনেকেই ভাবছিলেন, জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ আসলে প্রাকৃতিক ঘটনাই এবং তা ক্রমশ পরিবর্তনশীল। তাই নানান্ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা প্রকৃতিকে দেখার চেষ্টা করেছেন , জীবের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সেই ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির আর এক ফসল ছিলেন লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)। জীববিদ্যা ('বায়োলজি') শব্দটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বললেন, প্রাকৃতিক নিয়মে জন্ম নিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই জীব তার জন্মদাতা/দাত্রীদের থেকে একটু ভিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে হাজার হাজার বছর পরে সে যেন এক নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাঁর এই বক্তব্য পরবর্তীকালে ডারউইনকেও পথ দেখিয়েছে। অথচ জীববিজ্ঞানীদের রাজসভায় লামার্ক-এর কপালে তাচ্ছিল্য ছাড়া বিশেষ কিছু জোটেনি। এবং অত্যন্ত করুণ অবস্থায় জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লবের এই সমর্থকের। সে ছিল ১৮২৯ সাল। তার দু'বছর পরে ডারউইন চড়ে বসবেন 'এইচ এম এস বিগ্‌ল' জাহাজে, পাড়ি দেবেন গবেষণার অজানা রাজ্যে (১৮৩১-৩৬)। তারপর তিনি নিয়ে আসবেন প্রজাতির বিবর্তনের নবতর ধারণা।

সেই ধারণা, সেই ব্যাখ্যান বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতিষ্ঠা কালক্রমে প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সেই প্রতিষ্ঠানগত অভিমান নিয়ে আমরা, এই 'হোমো স্যাপিয়েন্স' ভেবে নিয়েছি যে, অন্য যাবতীয় প্রাণীর তুলনায় আমরাই যোগ্যতর, উন্নত, বিচক্ষণ এবং প্রাজ্ঞ। বিবর্তনের ফলেই আমরা এই প্রাজ্ঞতা অর্জন করেছি। কিন্তু বিবর্তন আসলে কী ?

২

প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, জীবেরও। কিন্তু ডারউইন আমাদের দেখালেন, বিবর্তন মানে শুধু পরিবর্তন না; এ হল পরিবর্তনের এমন এক ধারা যা অতীতের হাত ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এই পরিবর্তনকে বলা যায় অতি সরল থেকে সরল, সরল থেকে জটিলতর; বা অন্যভাবে বলতে গেলে অনুন্নত থেকে উন্নত

বা উন্নততর। এর পিছনে কোনো ঐশী শক্তি থাকে না, থাকে বরং প্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জীবকে তার পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে হয় আবার খাপ খাওয়াতেও হয়। এই কাজগুলো করতে করতে সে এলোপাথাড়িভাবে ('র‍্যান্ডম') নানান্ বৈচিত্র্য অর্জন করে। প্রকৃতি সেই বৈচিত্র্যগুলো থেকে যা যা লাভজনক আর সুবিধাজনক তা নির্বাচন করে দেয় ।

অর্থাৎ সহজভাবে বললে, জীবজগতে বেঁচে থাকার জন্য একটা সংগ্রাম চলে, সেই সংগ্রামে জয়ী হয়ে কেবল তারাই বেঁচে থাকে যারা যোগ্যতম; আর এগুলোর সঙ্গে থাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-র একটি ছক। এই ছক ধরেই নতুন এবং উন্নততর প্রজাতির সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো ঘটবে কী করে, কী তার পদ্ধতি ? এখানেই থেকে গেল একটি গুরুতর ফাঁক। কী করে এই ফাঁক ভরাট করা যায় তা ডারউইনের জানা ছিল না। সেই রাস্তা বেরল অল্প কিছুদিন পরেই। গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-৮৪) আর ওয়াইজম্যান (১৮৩৪-১৯১৪) রচনা করলেন বংশগতির তত্ত্ব। তাঁরা বলেছিলেন বংশগতির এক সূত্রের কথা, পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'জিন'।

তারপর ডাচ উদ্ভিদবিদ হুগো দ্য ভ্রেজের (১৮৪৮-১৯৩৫) হাতে জিনতত্ত্ব আরো বিকশিত হয়েছে, এসেছে 'মিউটেশন'-এর ধারণা, মানে জিনের চরিত্র বদল। জিনতত্ত্বের হাত ধরে ডারউইনের তত্ত্ব আরো পরিমার্জিত হল। বলা হল, জৈববিবর্তন মানে, আসলে তার জিনগত পরিবর্তন। তা আংশিক হতে পারে অথবা পূর্ণ। পরিবেশের প্রভাবে জিন-এর মধ্যে এলোপাথাড়ি পরিবর্তন ('র‍্যান্ডম মিউটেশন') হতে থাকে। তারপরে আসে প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা, – দরকারি মিউটেশনগুলোকে সে নির্বাচন করে দেয়। যেমন, শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি প্রাণীর যদি পুরু লোমের দরকার হয় তাহলে তার জিন-এর মধ্যে ঘটতে থাকবে এলোপাথাড়ি পরিবর্তন। তার ফলে পরবর্তীকালে যে সব প্রাণীর গায়ে পুরু লোম জন্মাবে তারাই বেঁচে থাকবে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে।

তেমনি, কোনো প্রাণী যদি উঁচু গাছের পাতার নাগাল না-পায় তো সে কী করবে? সে কি তার কণ্ঠদেশ লম্বা করে ফেলবে? নাকি প্রকৃতি তার চারধারে ছোটো ছোটো গাছ তৈরি করে দেবে? কোনোটাই না; বরং তার জিনের মধ্যে ঘটতে থাকবে এলোপাথাড়ি পরিবর্তন। তার ফলে পরবর্তীকালে যেসব প্রাণীর কণ্ঠদেশ হবে লম্বা তারাই বেঁচে থাকবে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারবে। আমরা তাদেরকে জিরাফ নামে ডাকব। তাহলে বিবর্তন = এলোপাথাড়ি বৈচিত্র্য + প্রাকৃতিক নির্বাচন; তারা উভয়ে উভয়ের সৌজন্যে বিরাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিবর্তনের ইতিহাস তো বিশাল, ব্যাপক; এইভাবে কি সেই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

ডারউইনবাদ সৃষ্টিতত্ত্বের কাঁধ থেকে ঈশ্বরের হাতটা সরিয়ে দিয়েছিল ঠিকই; জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক অসামান্য অবদান। কিন্তু এই তত্ত্ব মেনে নিয়ে, প্রথম জীবটি যে কীভাবে এল তা বোঝা যায় না। বিবর্তন তো পরের কথা; তার আগে তো প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে; সেটা হল কীভাবে? আদিমতম জীবটি কি কোনো মিউটেশন-এর ফল? কোন মিউটেশন? এই মহাবিশ্বে তাহলে অসংখ্য প্রজাতি সৃষ্টির জন্যে অসংখ্য মিউটেশনের দরকার পড়েছে। কিন্তু মিউটেশন তো অমন ভুরি ভুরি ঘটে না। উচ্চতর জীবের বেলায় বেশির ভাগ মিউটেশনের পুনরাবৃত্তির হার হল, একটি প্রজন্মের একটি জিনপিছু দশ হাজার থেকে এক লক্ষের মধ্যে এক বার। তা এলোপাথাড়ি ঠিকই; কিন্তু তাকে তো আবার 'উপযুক্ত' বা দরকারিও হতে হবে; অথচ মিউটেশন হয় খুব সামান্যই। নিম্নতর জীবের বেলাতেও একই কথা খাটে। তাহলে মিউটেশন দিয়ে বিবর্তনের ব্যাখ্যা কীভাবে হবে?

তাই কীভাবে ঘোড়া, বাঘ,জিরাফ,বেড়াল বা মানুষের মতো বিচিত্র জীবের উদ্ভব হল সেকথা এই তত্ত্ব থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাহাত্ম্য যে কী তাও স্পষ্ট হচ্ছে না। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে প্রাকৃতিক নির্বাচন অযোগ্যকে সরিয়ে দিয়ে একটা নঞর্থক ভূমিকা নেয়। তাহলে আর ঐশীবাদীরাই বা কী দোষ করল? প্রকৃতি (ঈশ্বর) যে অযোগ্য বা ক্ষতিকর যা কিছু তা বিনষ্ট করে দেন তা তো তারা অনেক আগেই বলে রেখেছে। অবশ্য এর বেশি কিছু তারা বলেনি। উল্টোদিকে, ডারউইনবাদীরা তো জিরাফের লম্বা গলা আর হিপোপটেমাসের ছোটো গলা ইত্যাদি কত কিছু বললেন,অথচ এই কথাটা বললেন না যে জীব খাপ খাওয়ায় ('অ্যাডাপ্টেশন') কীভাবে? আর বৈচিত্র্যই বা কী?

বৈচিত্র্য মানে তো জিনেরই অভিব্যক্তি। যেমন,জিনগত ভাবে দুনিয়ার সব মানুষই এক; কিন্তু কেউ ট্যারা, কারুর চুলের রং সাদা, কেউ বেঁটে ইত্যাদি। জীবের মধ্যে যে জিনসজ্জা থাকে তার নানান রকম বিন্যাসের ফলেই এই বৈচিত্র্য। সুতরাং বৈচিত্র্য সর্বদা জিনসজ্জার সীমানার মধ্যেই ঘটে থাকে। কিন্তু বৈচিত্র্য কখনো বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে না। জিনগত বৈচিত্রের ফলে কোনো সরীসৃপ কখনো পাখি হয়ে যায় না। ডারউইন ভেবেছিলেন বৈচিত্র্যের কোনো সীমা নেই। তাঁর যুক্তি ছিল, বিভিন্ন ধরনের ছাগলের মধ্যে যৌনমিলন ঘটিয়ে যদি বেশি দুধেল ছাগল তৈরি করা যায় তাহলে কালক্রমে এ থেকে নতুন প্রজাতিও তৈরি হবে। কিন্তু এটা হয় না; বরং ওরকম যৌনমিলন ঘটাতে গিয়ে দেখা যায় যে জীবের গঠনগত বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে বটে; কিন্তু তা হতে হতে প্রজাতি আবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। অর্থাৎ বৈচিত্র্য অসীম না,সসীম।

তাহলে বিবর্তনের এই ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা পেল কী করে? এ আসলে এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা আমাদের শিখিয়েছে যে সত্যের রহস্য ভেদ করার প্রধানতম হাতিয়ার হল এককটিকে ('ইউনিট') খুঁজে বার করা। এই শিক্ষা অনুযায়ী জীব, জীবসত্তা, জীবন এবং তার সঙ্গে জড়িত সবকিছুই খণ্ডনযোগ্য ('রিডিউসিব্‌ল')। তাই জিনকেই জীবের একক হিসেবে ধরতে হবে। জিনসজ্জাই ('জিনোম') জীবের নির্ধারক শক্তি, যেখানে লেখা হয়ে আছে আমাদের 'স্ক্রিপট অফ লাইফ' বা জীবনের চিত্রনাট্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির হাত ধরে কালক্রমে বিকশিত হয় 'নব-ডারউইনবাদ'। এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন আর্নস্ট মেয়র (১৯০৪-২০০৫), জুলিয়ান হাক্সলি (১৮৮৭-১৯৭৫) এবং ডবঝানস্কির (১৯০০-৭৫) মতো দিকপাল মানুষজন। আবার এই সূত্র ধরেই রচিত হয় 'সামাজিক ডারউইনবাদ'।

কিন্তু ডারউইন-তত্ত্বের সূত্রগুলো নিয়ে নানান্ দিক থেকে নানান্ প্রশ্ন উঠেছে। না-হয় শুধু যোগ্যতমই টিকে থাকল; কিন্তু যোগ্যতম কে? তার যোগ্যতা কীসে? শক্তিতে নাকি জ্ঞানে নাকি চাতুর্যে? প্রকৃতি কীভাবে সেই যোগ্যতা স্থির করবে? আর্থার কেষ্টলার (১৯০৫-৮৩) বলেছিলেন, এ আসলে এক গোলাকার যুক্তি। যোগ্যতম কে? যে বেঁচে থাকে সেই। বেঁচে থাকবে কে? যে যোগ্যতম সেই! যুক্তির এই গোলকধাঁধা আমাদের কোনো নতুন দিশা দেয় না। কেন একটি জীব যোগ্যতম? কেননা সে উৎপাদনশীল। আরো যোগ্য হতে গেলে তাকে আরো বেশি বেশি করে উৎপাদনশীল হতে হবে। কী করে তা হবে? তা হবে সংগ্রাম করে। জীবজগতের নির্দিষ্ট সীমানা আছে,তার সম্ভারেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য তাকে অবশ্যম্ভাবী, নিষ্ঠুর, নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। যুক্তিবিজ্ঞানের অবরোহী ('ডিডাকটিভ') পদ্ধতি আমাদের এই ধারণায় পৌঁছে দেয়।

ম্যালথুস এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছিলেন। জীবজগতে বংশবৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক নিয়মে, অথচ বাসস্থান ও আহার্যের পরিমাণ বাড়ে পাটিগণিতের নিয়মে। এর ফলে অনিবার্যভাবে তৈরি হবে সংকট। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একটি পদ্ধতি হল জীবের বংশবৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। এই ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অন্য অনেকের মতো ডারউইনের কাছেও আকর্ষণীয় ছিল। সত্যিই তো, জীবজগতে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা তো জরুরিই। যেমন ধরা যাক চড়ুই পাখি। জ্যামিতিক নিয়মে এক জোড়া চড়ুই পাখির থেকে দশ বছরে আমরা পাব ২৮০০ কোটি পাখি। বিষম সংকট তাহলে! অথচ বাস্তবে দেখা যায় ওরকম ব্যাপক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না; বরং সুদীর্ঘকাল ধরে প্রজাতির সংখ্যা মোটামুটি একই রকম থেকে যায়। কীভাবে, তা বলতে গিয়ে ডারউইন তাকালেন হার্বার্ট স্পেন্সার-এর (১৮২০-১৯০৩) দিকে। ১৮৬৪ সালে তাঁর 'প্রিন্সিপিলস অফ বায়োলজি' গ্রন্থে হার্বার্ট স্পেনসার 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকার' ধারণাটি ব্যবহার

করেছিলেন। ডারউইনও তা ব্যবহার করলেন। সকলে বাঁচে না। কেউ কেউ বাঁচে। কে বাঁচে? যে যোগ্যতম সে।

৩

তাই বিবর্তনের ডারউইনীয় ধারনাটির মূল সুর হল প্রতিযোগিতা; ক্রমশ তীব্রতর প্রতিযোগিতা। প্রতিটি প্রজাতির প্রতিটি সদস্যকে লড়ে যেতে হবে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, আর সেই লড়াই চলবে নিজেদের মধ্যেও। এর ফলে তারা পাবে বিচিত্র গুণ। এই বৈচিত্র্য ('ভ্যারিয়েশন') জমতে থাকবে হাজার হাজার বছর ধরে, পরিবাহিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠবে জীব। তাদের গঠনগত পরিবর্তন ঘটবে আর সেই সঙ্গে পাল্টে যাবে স্বভাব, বৈশিষ্ট্য। নানান্ প্রজাতির মধ্যে যারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সুবিধেটুকু পেয়ে যায় তারাই বেঁচে থাকে, আর তারাই পারে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন ধরনের জীবের সৃষ্টি করতে। তাই মোদ্দা কথায়, খাপ খাওয়াতে ('অ্যাডাপটেশন') পারলে থাক, না-পারলে যাও জাহান্নমে। 'অযোগ্য' মানুষ যে ক্রমাগত জাহান্নমে যাবে, এমনই এক বর্বর সমাজের ছবিই তো এঁকেছিলেন ম্যালথুস।

আসলে এই ছবিটি ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় সমাজের ছবি। একেই নানাভাবে অলংকৃত করেছিলেন টমাস হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) বা অনেকের মতে, ফ্রয়েডও (১৮৫৬-১৯৩৯)। কিন্তু জীবজগত কি সত্যিই

কুরুক্ষেত্র? উৎপাদনশীলতাই কি যোগ্যতার মাপকাঠি? আমাদের এই মনুষ্যপ্রজাতিতে, উৎপাদনশীলতার নিরিখে মহিলাদের বেঁচে থাকবার অধিকার তো পঞ্চাশ বছর বয়সেই ফুরিয়ে যাবার কথা। অথচ তা তো হয় না; বরং উল্টো; পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ুষ্কাল বরং বেশি। এসব কথা ওঠেই; অথচ সদুত্তর নেই। বরং ম্যালথুস বা হাক্সলি বা ডারউইনের কাছ থেকে আমরা পেলাম একটি আদ্যোপান্ত প্রতিযোগী, মুনাফালোভী, যৌনাকাঙ্ক্ষায় কাতর সমাজের ছবি। এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক ডারউইনবাদের তত্ত্ব।

শুধু মানুষ কেন, কোনো প্রাণীরই অমন জঙ্গিবাদী, শাশ্বত চরিত্র থাকে না। যেমন, প্রাণীদের মধ্যে অমন নৃশংস প্রতিযোগিতার বদলে পিটার ক্রোপোটকিন (১৮৪২-১৯২১) দেখেছিলেন অপরূপ সহযোগিতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত। প্রাণীবিদ ওয়াইন এডওয়ার্ড (১৯০৬-৯৭) দেখিয়েছেন, জীব নিজের স্বার্থেই অদ্ভুত উপায়ে কীভাবে নিজের জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখে; কোনো দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর সৃষ্টি করে দুর্বলকে বিলুপ্ত করে নয়, বরং নিজের বংশবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একই কথা শুনিয়েছেন উদ্ভিদবিদ ব্র্যাডশ (১৯২৬-২০০৮)। এমনকী, জীবাণুও সহ-নাগরিকের স্বার্থে আত্মবলি দেয়। তাছাড়া, টিকে থাকার লড়াই থেকে প্রজাতির উত্তরণ হবে কীভাবে? বাঘের হাত থেকে কেবলমাত্র ক্ষিপ্রতম, দৌড়বীর হরিণই না-হয় বাঁচবে; কিন্তু হরিণ তো কখনো পাখি হতে পারবে না। খাপ খাওয়াতে পারলেও তো নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে না।

এই যে আরশোলার মতো খুব ক্ষুদ্র বা নিরীহ প্রাণী একই অবয়বে টিকে থাকছে সুদীর্ঘকাল, তা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে; আরশোলা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে বলে। আবার এই যে ডাইনোসরের মতো দশাসই জীব ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেও তো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই; ডাইনোসর খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে। তাহলে কি যারা খাপ খাওয়াতে পারে না তাদের বিলুপ্তির পথ রচনা করে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ জীবজগতে কেবল ঋণাত্মক অবদানই রেখে গেল? কেননা, সে তো কোনো প্রজাতির মধ্যে কোনো নতুন জৈবিক গুণ সরবরাহ করতে পারল না, নতুন অঙ্গও তৈরি করতে পারল না। তাহলে বৈচিত্র্য যে কীভাবে তৈরি হবে তার উত্তর কি জিন-বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে?

তাও পাওয়া সম্ভব না। বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন একটি প্রাণবৃক্ষের কল্পনা করেছিলেন (‘ট্রি অফ লাইফ’)। তার মূল একটাই, আর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। জিনের মিউটেশনের ফলে তৈরি হয়েছে ওই শাখা-প্রশাখাগুলো; এইভাবে কালক্রমে, বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়ে গেছে জীবের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আধুনিক জিন গবেষণা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে জিন শুধু অমন একমুখীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না; সে আশ-পাশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, যাকে বলে জিনের সমান্তরাল স্থানান্তরণ

('হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার')। অর্থাৎ জিন একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে বদলি হয়ে যায়। তার মানে, একটি মাত্র সরল, আদিম কোষ থেকেই ক্রমশ জটিলতর জীবের সৃষ্টি হয়েছে তা না; বরং কোষের একটি সম্প্রদায়কেই জীবের আদিমতম উৎস বলে ভাবতে হয়। তার মানে, প্রাণবৃক্ষের মূলটি নিজেই আসলে মাকড়সার জালের মতো, যাকে বলে প্রাণ-জালিকা ('ওয়েব অফ লাইফ')।

জীবসৃষ্টির মৌলিক প্রশ্নে তাই ডারউইনবাদ আমাদের নিরাশ করে। জীবের বিবর্তন তো পরে, তার আগেই ঘটে গেছে রাসায়নিক বিবর্তন। আর তারও আগে ঘটে গেছে মৌলিক উপাদানগুলোর বিবর্তন। রাসায়নিক বিবর্তনের প্রায় শেষ পর্যায়ে শুরু হয় জৈব বিবর্তন। একেই কেউ কেউ বলেছেন 'আর এন এ জগৎ'। বিবর্তন তাহলে এক বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া; শুধু জীবজগৎ নয়, বস্তুজগৎও ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই ইতিহাস কোনো সুনির্দিষ্ট ধারা বেয়েও প্রবাহিত হয় না। কী-করে কোনো কোনো প্রজাতি প্রকৃতির স্নেহধন্য হয়ে যায়, তা আজও জানা নেই। নেই বলেই অনুমানের সুযোগ এখানে অফুরন্ত। তাই হনুমানও মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে একটি অনুমান। যাবতীয় সৃষ্টির প্রাচীনতম রূপ হিসেবে মৎস্য অবতারও ছিল অনুমান। তাই বির্তকটা আছে। মুশকিল হল এই বির্তকে যতটা ঝাল থাকে ততটা আলো থাকে না। তাহলে আলোর পথযাত্রী হোমো স্যাপিয়েন্স কী করবে ? সে কি ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকেই নত মস্তকে মেনে নেবে?

অত নত হলেও তো বিপদ। কারণ, বিবর্তনের জল যে বড় গভীর আর উত্তাল। এত গভীর যে এখন আমরা জানতে পারছি, জিন-এর সঙ্গে ('জিনোটাইপ') জীবের বৈশিষ্ট্যের ('ফিনোটাইপ') বিষয়টি একরৈখিক না। বরং কোষের মধ্যে, জিনের মধ্যে এবং জিনের অভিব্যক্তির মধ্যে বহু বহু জটিলতা ও গতিময়তা ('ডাইনামিজম') কাজ করে। সেই গতিময়তাকে ধরতে না-পারলে প্রাণ সৃষ্টির প্রাক্‌পর্বটি ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেকে ভেবেছিলেন, ভূত্বকের আধুনিক স্তর থেকে প্রাচীনতম স্তরে জীবাশ্ম খুঁজলেই বিবর্তনের হদিশ পাওয়া যাবে। তা যায়নি। বরং দেখা গেল, হঠাৎ হঠাৎ করে নতুন নতুন জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে; অথচ মাঝখানের জীবগুলোর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই তথ্য থেকে তৈরি হল যতিচিহ্ন-যুক্ত সাম্যাবস্থার ('পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম') তত্ত্ব। সৌজন্যে স্টিফেন জে গৌলড (১৯৪১-২০০২)। জীবকূলে দেখা গেল হাজার হাজার বছরের স্থিতাবস্থা ('স্টেসিস') আর তারপর নাটকীয় পরিবর্তন। এই তত্ত্ব বিবর্তনকে অন্যভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানান্ তর্ক-বিতর্কও হয়েছে, আজও হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা জরুরি কথা এই যে জীবাশ্ম মানে তো পাথরের গায়ে বিলুপ্ত প্রজাতির ছাপ। ছাপ থেকে সেই প্রজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ না-হয় মিলল; কিন্তু

তা থেকে কি সেই প্রজাতির প্রাণের স্পন্দনের বা অন্তর্গত কর্মকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়? মনে হয়, এ এক অসম্ভব প্রস্তাব।

সমস্যা আরো আছে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাণের তো মোটে পাঁচটি সাম্রাজ্য ('কিংডম অফ লাইফ'); তা দিয়ে নিশ্চয়ই আদিম থেকে আধুনিক জীবের বিবর্তন বর্ণনা করা যাবে। তা যায়নি। বরং কেউ কেউ বলেছেন, প্রাণের মোটে পাঁচটি কেন, তিরিশটি সাম্রাজ্যও থাকতে পারে! বাস্তবকে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে, জীববিদ্যায় এইভাবে কুহেলিকাই ক্রমশ আমাদের গ্রাস করে। এমনকী, জিন গবেষণাও যত সমৃদ্ধ হয়েছে রহস্য ততই ঘনীভূত হয়েছে। আমি যে কেন আমি, কেমন করে আমি 'আমি' হয়ে উঠলাম তার কোনো স্পষ্ট জবাব মেলে না। আমাদের হাতদুটি যে কীভাবে এত কুশল আর মুদ্রার ভঙ্গিতে এত বাঙ্ময় হয়ে উঠল, চোখের মতো এত অদ্ভুত জটিল এক যন্ত্রের উদ্ভব কীভাবে ঘটল, ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের কাছে তা ব্যাখ্যাতীত। শুধু জিনসংকেত দিয়েই এই অপরূপ লালিত্যময় মানবদেহের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে গেল, তা ভাবা মুশকিল।

এটাই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের সীমাবদ্ধতা, যা আসলে খণ্ডতাবাদেরই ('রিডাকশনিজম') সীমাবদ্ধতা। কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের একরৈখিক ('লিনিয়ার') সমীকরণের প্রতি আকৃষ্ট করে। আমরা ভাবতে থাকি, জীব তো সরল থেকেই জটিল হবে। অথচ তা কি সত্যি? ক্ষুদ্রতম জীবাণুকোষের ওজন তো মাত্র ০.০০০০০০০০০০০১ গ্রাম; মানে তুচ্ছই, কিন্তু তা কি সরল? তার ভিতরে তো থাকে দশ লক্ষ পরমাণু! একটা জাইগোট তো সুচের অগ্রভাগের মতো। কিন্তু এতে যা বার্তা ('ইনফর্মেশন') রাখা থাকে তা ৬০ লক্ষ রাসায়নিক অক্ষরের ('কেমিকাল লেটার') সমান। তার মানে তা দিয়ে ৫০০ পাতার এক হাজারটা বই ছাপানো যায় যার প্রতিটি অক্ষর পড়তে লাগবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তাহলে সারল্য কোথায়; বরং এ এক অভাবনীয় জটিলতা! একেই অনেকে বলেছেন অহ্রসনীয় জটিলতা ('ইরিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি')।

তাহলে আমরা করবটা কী? অনেকে ভাবেন, প্রকৃতিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঈশ্বর না ঢুকে পড়েন। ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা বা ঐশীবাদ আমাদের নিশ্চেষ্ট করে রাখে; আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডের যুক্তি সাজাতে পারি না। তাছাড়া, সৃষ্টিতত্ত্ব ('ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন') শুধু ঘোষণা দেয়, কোনো ব্যাখ্যা দেয় না। অন্যদিকে, ভুল হোক ঠিক হোক, ডারউইন তো তবু একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, একটা কর্মকাণ্ডের কথা বলেন, একটা 'অ্যাকটিভিটি'। অগ্রগতির বাজারটা যে নৃশংস প্রতিযোগিতার বাজার তা তো বাস্তব। এটা মেনে নিতে পারলে আমরা ঈশ্বরের নাগাল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন নাগরিক হতে পারি। তাই ডারউইনকে মানতে হয়।

কিন্তু মেনে নিয়ে, আধুনিক ক্যানসার চর্চায় আমাদের কী উপকার হল তা এবারে দেখা যাক।

৪

কেন আমাদের এত রোগ হয়? কেন আমাদের অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা ওঠে, কেন আমাদের বাতের ব্যথা হয়? আমরা তো 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর ফলেই যোগ্যতম হয়েছি। তাহলে আমাদের শরীরটা এমন ব্যাধিমন্দির হয়ে উঠল কেন? ডারউইনবাদীরা বলেন, তাই তো হবার কথা। আমাদের শরীরটা তো আসলে পুরনো কোনো শরীরেরই বিবর্তনলব্ধ রূপ; ফলে পুরনো খুঁতগুলোর কিছু অবশিষ্ট থাকবেই, আর তার জন্য আমাদের দুর্ভোগও লেগেই থাকবে। তবে আশার কথাও আছে। যেমন, আমাদের টিকে থাকতে হয় লড়াই করে। জীবাণু, কীট-পতঙ্গ, পশু বা এমনকী, অন্যান্য মানুষও আছে যারা আমাদের ক্ষতি করে দিতে পারে। সেই ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের শরীরে আছে প্রকৃতিদত্ত রক্ষাকবচ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যাদের শরীরে এই ব্যবস্থাগুলো মজবুত থাকে, প্রাকৃতিক ভাবে তারা যোগ্যতর। তাদের দুর্ভোগ কম।

বেশ! কিন্তু তাহলে তো আমাদের আর তেমন কিছু করার থাকল না! যা আছে তা নিয়েই থাকতে হলে তো এক হিসেবে তা নিয়তিবাদ! আবার অন্যদিকে, ওই একই ব্যাখ্যা থেকে আসে সৌজাত্যবাদের ('ইউজেনিক্স') তত্ত্ব। সে বলে, জিনগতভাবে (মানে, প্রাকৃতিকভাবে) যারা যোগ্যতর, বেঁচে থাকার অধিকার প্রধানত তাদেরই। যারা যোগ্য না তাদেরকে হয় মরতে হবে নয়তো যোগ্যদের মতো নিখুঁত শরীর আমরা গড়ে নিতে হবে। তা আমরা পারি, কেবল যদি বির্বতনের দিক-নির্দেশ আমরা নিজেরা রচনা করে নিতে পারি। সে-কাজ আমাদের করতেই হবে কেননা বর্তমান সভ্যতা নেহাত বোকার মতো অযোগ্য মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে প্রাকৃতিক নির্বাচনটাকে বিকৃত করে ফেলছে। কথাগুলো নাৎসিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে মনে করিয়ে দেয়। এখান থেকেই আসে আরো নিখুঁত, আরো সুন্দর, আরো বিজ্ঞানসম্মত মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা। এ-ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছে চার্লস ড্যাভেনপোর্ট-এর কাছে ('হেরিডিটি ইন রিলেশন টু ইউজেনিক্স', ১৯১০)।

সৌজাত্যবাদ কিন্তু হিটলারের নাৎসিবাহিনীর অবদান না। নাৎসিবাদের উত্থানের আগেই, ১৮৮৩ সালে খোদ ইংল্যান্ডে এর জন্ম; আর জন্মদাতা হলেন স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন (১৮২২-১৯১১), যিনি আবার সম্পর্কে ছিলেন ডারউইনের ভাই। অবশ্য সৌজাত্যবিদ্যা তার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল আমেরিকাতেই। ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেনসারের (১৮২০-১৯০৩) তত্ত্বের ভিত্তিতে, মার্কিনি সংবাদমাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং রকফেলার ও কার্নেগির মতো ধনকুবেরদের অর্থসাহায্যে তৈরি হয়েছিল সামাজিক

ডারউইনবাদ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে, জিনসর্বস্ব ধারণার পিছনেও আছে সামাজিক ডারউইনবাদের অবদান।

সামাজিক ডারউইনবাদ মনে করে, জিন-এর চরিত্র দিয়েই আমাদের যাবতীয়, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি রোগ-বিরোগের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই বিজ্ঞতা সম্বল করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ভাবেন, ডায়াবিটিসের জিনটা খারাপ, হৃদরোগের জিন খারাপ, আর ক্যানসারের জিন তো অতি জঘন্য। তাঁরা রোগের কারণ খুঁজতে থাকেন জিন-এর নষ্ট-চরিত্রের মধ্যে। রোগ থেকে রেহাই পেতে গেলে নাকি নষ্ট জিনকেই নিকেশ করতে হবে। জীবনটা যেন এক যুদ্ধের পটভূমি। অথচ শুধু দীর্ঘমেয়াদি রোগই না, স্বল্পমেয়াদি রোগগুলোকেও ওভাবে দেখা যায় না। এমনকী, আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ('ইমিউনিটি') চর্চা অনেক পথ পরিক্রমা করেও আর কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে এই দৃষ্টিভঙ্গি রোগের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বহুমাত্রিক ('নন-লিনিয়র') সম্পর্কটা মুখে মানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মানতে চায় না।

তাই কৌতুকময় মনুষ্যদেহের আশ্চর্য বর্ণময়তায় আলোকিত হবার বদলে আমরা ভেবে নিলাম, এই মানবদেহ যেন এক অনন্তর গোয়েন্দাগিরির ময়দান। গোয়েন্দার মতো আনাচ-কানাচে লুকিয়ে থাকা নষ্ট জিনটাকে খুঁজে বার করে আনতে হবে। আমরা বুঝতে পারি না যে শুধু জিন না, আমাদের শরীরে আরো অনেক রহস্য আছে যা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জিনের বাইরে এমন কিছু সংকেতবাণী ঘুরে বেড়ায় যারা জিনকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চুপ করে দিতে পারে। এদেরকেই জিনোর্ধ্ব ('এপিজিনেটিক') সংকেত বলে বর্ণনা করা হয়। সেখানে গোয়েন্দাগিরি চালাতে গেলে তার কোনো শেষ থাকবে না। তার চেয়ে বরং সেই আশ্চর্য গতিময়তা, সেই বিপন্ন বিস্ময়ের চর্চাই আমাদের আরো অনেক বেশি আলোকিত করে তুলতে পারে। তা না-করে আমরা যে সরল অঙ্কের ধাঁচ মেনে নিয়েছি, বিপদ সেখানেই।

বিপদ এই ভাবনায় যে গোয়েন্দাগিরিতে আমরা যত ধুরন্ধর হয়ে উঠব ততই আমাদের আধুনিকতা প্রমাণ হবে। আমরা ভাবিনি যে কখনো-সখনো গোয়েন্দাগিরির দরকার আছে বটে; কিন্তু তা সময়ে-সময়ে ক্লান্তিকর। তখন মনে হয়, রণক্লান্ত বিদ্রোহীর মতো আমরা যেন সমস্যার পরিধি ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছি; অন্তর্বস্তু যেন ছলনাময়ী। আধুনিক চিকিৎসকদের মনোজগতে অচিরে তাই হতাশা দানা বাঁধে। একটি কৌতূহলজনক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৬ সালে পুরুষ চিকিৎসকদের প্রায় ৬০% চিকিৎসা পেশায় যুক্ত থাকার জন্য অনুতপ্ত থাকতেন। এই হার এখন নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে। অথচ ১৯৮১ সালে তা ছিল

৪৫%, ১৯৭৬ সালে ছিল প্রায় ২৫%, আর ১৯৬৬ সালে ছিল মাত্র ১০%! এই ঊর্দ্ধমুখী হতাশা কি আর আধুনিকতা প্রমাণ করে?

কেবল চিকিৎসকই না, আধুনিক চিকিৎসার ধরন আর ধাঁচ মানুষকেও যতটা আপাত সুখের সন্ধান দিয়েছে ততটা স্বস্তি দেয়নি। যেমন, ১৯৬৮ আর ১৯৯৬ সালের তুলনা করে আরেকটি পরিসংখ্যান দেখায়, সাধারণ মানুষজন তাঁদের শরীরটাকে নিয়ে কী ভাবেন! যাঁরা ভাবেন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবদানে শরীর ক্রমশ উন্নত হচ্ছে তেমন মানুষের সংখ্যা ৭০% থেকে কমে হয়েছে ৩৫%। যাঁরা ভাবেন, শরীর উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে তাঁদের সংখ্যা ১৫% থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০%। তার মানে, আমরা ভাল থাকছি নাকি থাকছি না তা নিয়েই সংশয়। আমাদের স্বস্তি নেই। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান তো আমাদের স্বস্তির সন্ধান দেবে বলেই কথা দিয়েছিল।

কথা তো সে রাখল না। কেন রাখল না? অথচ একটু চোখ মেলে তাকালেই তো আমরা দেখি, মানুষের জীবনযাত্রা আরো সুগম করতে গিয়ে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী না করেছে। পেনিসিলিন আবিষ্কার থেকে রেডিওথেরাপি, বাই-পাস, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ডায়ালিসিস, স্ক্যান, নলজাতক, এবং ভায়াগ্রা। সবই তো এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দান। তাহলে? আসলে একটু মনোযোগ দিলেই আমরা দেখব, চিকিৎসাবিজ্ঞানের চমকপ্রদ অবদানগুলো ক্রমশ তার ধার হারাচ্ছে, সে যেন একই চক্রপথে ঘুরতে–ঘুরতে কেবল কালের সাক্ষী হয়ে পড়ল। অন্তর্বস্তুর কাছে তার যাওয়াই হল না। সেখানে না-গেলে স্বস্তি মিলবে কী করে?

প্রাতিষ্ঠানিক ক্যানসারচর্চাতেও সেই ডারউইনেরই ছায়া। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী, এক বা একাধিক কোষের এক বা একাধিক জিন-এর মধ্যে সুযোগমতো ('চান্স'), এলোপাথাড়িভাবে মিউটেশন ঘটে যায়। তাতে কোষের স্বভাব বদলে যায়। এই কোষ স্বাভাবিক কোষের তুলনায় বলশালী, কিন্তু নষ্ট চরিত্রের। সেই নষ্ট কোষও প্রাকৃতিকভাবে 'নির্বাচিত' হয়ে যায়; তাই সে টিকে থাকতে পারে, বংশবৃদ্ধি করতে পারে, ছড়িয়েও পড়তে পারে। এই হল ক্যানসার। তার সঙ্গে স্বাভাবিক কোষের একটা যুদ্ধ চলতে থাকে; আর সেই যুদ্ধে ক্যানসার কোষই জেতে। তারপর আরো মিউটেশন হয়, ক্যানসার কোষ আরো বিবর্তিত হয়, আরো বিধ্বংসী হয়; সেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে। কেন যে প্রকৃতি অমন নিষ্ঠুর আচরণ করে তা কিন্তু কেউ জানে না। এর নির্গলিতার্থ হল,আমাদের জিন-সংগঠন এমনই পলকা যে তা যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে। তাই কিছু মানুষ থাকবেন যারা ঠিক টিকে থাকার যোগ্য না; তাদেরকে ক্যানসারের ভার বইতে বইতে যথাশীঘ্র বিদায় নিতে হবে। অতএব, কী আর করা!

কিন্তু সামাজিক ডারউইনবাদ এখানে থেমে থাকে না। সে বলে, করার অনেক কিছু আছে। যেমন, ক্রিয়াশীল মানুষ হিসেবে আমরা ওই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত ক্যানসার কোষগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারি। অর্থাৎ 'ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। সেই যুদ্ধ আমরা বেশ কিছুকাল ধরে চালাচ্ছি। কিন্তু সেখানেও ধন্দ; কেননা যুদ্ধ চালাতে গিয়ে দেখছি, এই যুদ্ধ তো শুধু নষ্ট কোষের বিরুদ্ধে না; বরং যেকোনো কোষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। কারণ, ক্যানসার আমাদের কোষীয় বিবর্তনের পরিণতি হিসেবে, অন্যান্য কোষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, অবিচ্ছেদ্য। চরিত্র আলাদা হলেও জিনগতভাবে ক্যানসার কোষের সঙ্গে অন্যান্য কোষের কোনো বুনিয়াদি তফাৎ নেই। তাই যুদ্ধ চালাতে গিয়ে উঠে আসছে বিচিত্র সমস্যা।

কেমন সে সমস্যা? যেমন, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে গিয়ে রাষ্ট্র যা করে প্রায় তেমনই! গত শতকের চল্লিশের দশকে আমরা শুনতাম, একটা সুস্থ, সভ্য সমাজে হিংস, দুর্বৃত্তরা যেমন আচরণ করে, মানবদেহে ক্যানসার কোষের আচরণও ঠিক সেই রকম। দুর্বৃত্তদের জন্ম হয় কোনো না কোনো অস্বাভাবিক পরিবেশে, সে মানবসমাজই হোক বা কোষের সমাজ। দুর্বৃত্তরা আসলে একই রকম। তাই তাদেরকে ধ্বংস করাই আমাদের পবিত্র কাজ। সেই কাজে শুধু বিজ্ঞানীরা না, জনসাধারণকেও সক্রিয় হতে হবে। এই ধারণা নিয়েই তো আমরা পুরোদমে যুদ্ধে নেমেছিলাম। অথচ তাতে ক্যানসারের হার কমেনি। আর ক্যানসার-জনিত মৃত্যুর হার কমেছে বলে যা বলা হয় তা নিয়েও অনেক সংশয়।

অন্তত ষাট বছর ধরে এতসব সংশয় আর সমস্যা ঘাড়ে করে অবশেষে নতুন শতকে এসে আবার শুনছি, নতুন-নতুন ওষুধের বিরুদ্ধে ক্যানসার কোষগুলো যে ক্রমান্বয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, এটাই নাকি ক্যানসার শাস্ত্রে এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী, 'লক্ষ্যভেদী' ওষুধগুলোও ('টার্গেট থেরাপি') লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। তার মানে, গত শতকে যা ছিল উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, নতুন শতকে তা পরিতাপে পরিণত হয়েছে। মানবসমাজই হোক বা কোষের সমাজ, কোথাও আমরা বর্বর দুর্বৃত্তদের সভ্যতা শেখাতে পারিনি। না মানবসমাজ, না কোষের সমাজ কোথাও কোনো নিরাপত্তার আশ্বাসও রাখতে পারিনি। এই পরিণতি দেখে চিত্ত মোটেই প্রফুল্ল হয় না। বরং ক্যানসার-চর্চা নিয়েই আমাদের উদ্বেগ বাড়ে, সংশয়ও বাড়ে; কোনোটাই কমে না।

সংশয় এই কারণে যে এই যুদ্ধের ফল তো শুধু শূন্য হয় না, হয় বিয়োগান্ত। অতএব এখন বোঝা যাচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ আমাদের অসুখ-বিসুখের শতকরা আশি ভাগই হবে আধুনিক চিকিৎসার অবদান ('আয়াট্রোজেনিক')। তার মানে, মননের দিক থেকে ক্যানসার প্রতিষ্ঠানগুলো আজও মধ্যযুগেই পড়ে আছে। তারা ভাবে, প্রকৃতিকে শত্রু আর মিত্র এই দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়। তেমনি, আমাদের দেহপ্রকৃতি, আমাদের জৈবিকতার মধ্যেও শত্রু-মিত্র প্রভেদ খুঁজে বার করতে হবে। তাই ক্যানসার একটা পরজীবী, আমাদের শত্রু। যুদ্ধ করেই তাকে পরাস্ত করতে হবে। আধুনিক জীবন আর আধুনিক বিজ্ঞানের করুণায় আপাতত এমন একটা সরল, যান্ত্রিক ফরমুলায় আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি।

এই বিশ্বাস ক্রমশ এমন প্রস্তরীভূত হয়েছে যে আমরা ভুলে গেলাম, প্রকৃতি আসলে একটি অতি জটিল 'ফেনোমেনন', সে এক বিচিত্র জালবিন্যাস। এও ভুলে গেলাম যে এই জালবিন্যাস, এই মহাজালিকা নিজেই একটা জীবন্ত সত্তা, একটা 'সিস্টেম'। এই জালবিন্যাসের এক অতিক্ষুদ্র অতি সামান্য উপাদান হল মানুষ, আমাদের মানবজগৎ। তাই ক্যানসারকে একটা বাইরে থেকে আমদানি করা, পরিবেশের সমস্যা হিসেবে দেখলে সেটা যান্ত্রিকতা ছাড়া আর কী? পরিবেশ কি দেহের বাইরেই থাকে? দেহের বাইরে যা থাকে সে তো আমাদের প্রতিবেশ। আমরা তাকেই পরিবেশ ভেবে নিয়ে আমাদের দেহের মধ্যে, প্রতিটি কোষের মধ্যে যে অনন্য পরিবেশ রচিত হয়ে আছে তার কথা ভুলে যাই। সেই পরিবেশই তো আমাদের জৈবিকতার চাবিকাঠি।

আমরা জীবাণুর জগতকে ভাবি, আমাদের শত্রু; অথচ সেই প্রাচীনতম জগতে অর্বাচীনের মতো প্রবেশ করে আমরাই যে তাকে আক্রমণ করে বসে আছি সেকথা ভুলে যাই। এই যান্ত্রিক ধারণা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যানসারবিদ্যা আমাদের কোনো নতুন দিশা দেখাতে পারছে না। ইঁদুরকে 'ক্ষুদ্র মানুষ' বলে

ধরে নিয়ে গবেষণাগারে আমরা ক্রমান্বয়ে ক্যানসার সারিয়ে দিচ্ছি, অথচ গবেষণাগারের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে আমরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটা সঙ্কটের জালে জড়িয়ে আমরা এখন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছি। তাহলে এখন কী করা ?

৬

মনে হয়, ক্যানসারকে পরজীবী বলে দেখাটা চূড়ান্ত মূর্খামি। জীবের শরীরে ক্যানসার একটি স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন। এই সৃজনে, জিন-এর সঙ্গে জিন-এর এবং জিনের বাইরের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে গতিময় প্রক্রিয়া থাকে। সেই জটিল গতিময়তাই ক্যানসারকে তার মৌলিক চরিত্র দান করে। মিউটেশন দিয়ে এই জটিল গতিময়তাকে বোঝা যায় না। তাকে বুঝতে গেলে দরকার একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। ধরিত্রী নিজেই একটি জীবের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ, সু-সংগঠিত এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জীব তার প্রতিবেশী সমেত একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়। এমন নয় যে এক দিকে জড় ধরিত্রী আর অন্য দিকে জীব; দ্বিতীয়টি প্রথমটির সঙ্গে ক্রমাগত খাপ খাইয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি প্রজাতির জীবসত্তা নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ। সেই জীবসত্তার মধ্যেই ক্যানসার আর একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণ জীবসত্তা হিসেবে প্রকাশিত হয়, বিবর্তিত হয়। ক্যানসার এক অন্য প্রজাতি-চরিত্র ('স্পিসিস ক্যারেকটর')।

আনুষ্ঠানিক ক্যানসার বিজ্ঞান এই যুগ্ম-বিবর্তনকে ('কো-এভোলিউশন') বুঝতে চায় না। কারণ, পূর্ণতার ব্যাখ্যা, প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাখ্যা, আর স্ব-সৃজনের ব্যাখ্যা ডারউইনীয় মডেলের হাতে নেই। ক্যানসার বিজ্ঞানে জিনের যে-মডেলটিকে নিয়ে আমাদের চর্চা তা দিয়ে শুধু হিমশৈলের ভাসমান চূড়াটুকুই দেখা যায়, এর বেশি কিছু না। চূড়াটা মিথ্যে না, কিন্তু তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই হিমশৈলটাকে বুঝে ফেলবো এই ভাবনাতেই আমাদের যত বিপত্তি। খণ্ডতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই বিপত্তির মধ্যে ফেলে দেয়। যে-মিউটেশন নিয়ে আমাদের এত পরিতাপ, ক্যানসার সৃষ্টিতে তার অবদান যে সত্যিই কতটুকু তা নিয়েই এখন বিজ্ঞানীদের একাংশের সংশয়। মিউটেশনকে নাকি ক্যানসারের 'কারণ' না-বলে তার 'পরিণতি' হিসেবেও দেখা যায়।

আসলে সৃষ্টির 'কারণ' আর 'ব্যাকরণ' আমরা গুলিয়ে ফেলেছি। এও মনে রাখিনি যে 'আদিম ঝোল' ('প্রাইমর্ডিয়াল সুপ') ছিল মূলত ক্যানসার-ধর্মী, অমরত্বের প্রতিভূ। তা ছিল 'প্রাণের পূর্বাবস্থা'; তা থেকেই প্রাণের সৃষ্টি, আর সেই সৃষ্টির সর্বোত্তম আবিষ্কার হল মৃত্যু। তাহলে ক্যানসার থেকেই আমাদের জন্ম, হয়তো ক্যানসারেই আমরা বিলীন হয়ে যাব। তার মানে, জীববিজ্ঞানের খণ্ডতাবাদী চর্চা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, বিদ্বান করেছে, কিন্তু প্রাজ্ঞ করতে পারেনি।

তাই মনে হয়, জীববিজ্ঞানের সূচিমুখ পাল্টাবে। জীববিজ্ঞানের ডারউইনীয় চর্চা জীবকে দেখেছে একটা মেশিনের মতো; কিন্তু মেশিন নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে না, জীব তা পারে। জীব তাহলে কী? কীভাবে তাকে বুঝতে হবে? ধরা যাক, একটি শিশু একটা কাঠি দিয়ে পুকুরের জল নিয়ে খেলছে। জল বার বার সরে যাচ্ছে, বার বার এসে জমছে। জীব হচ্ছে তাই, – উত্তাল প্রবাহের মধ্যে এক স্থিতিস্থাপক বিন্যাস। এই জটিল এবং গতিময় বিন্যাসকে বুঝতে পারলে আমরা এও বুঝব যে ক্যানসার সৃষ্টির যেমন একটা অবশ্যম্ভাবিতা আছে তেমনই আছে এক সম্ভাব্যতা। জীববিজ্ঞানের এই অমোঘ বাস্তবতাকে আমরা এড়িয়ে থাকতে পারব না।

ডারউইন (১৮০৯-৮২)। এই একটিমাত্র শব্দবন্ধ দিয়ে আমরা, এই আধুনিক মনুষ্য-প্রজাতি আমাদের শিরস্ত্রাণ রচনা করেছি, তার ওপর লাগিয়েছি আরো পালকগুচ্ছ, তারপর বিজয়ীর পদচিহ্ন এঁকে চলেছি ধরিত্রীর বুকে। ওই শব্দবন্ধের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে সেই যুক্তির সজ্জা যার জোরে আমরা আদিম মানুষকে বলতে পারি বর্বর, সাদার মোড়ক দিয়ে শাসন করতে পারি কালো চামড়াকে। ডারউইনই আমাদের শিখিয়ে দেন ঘুণপোকা কেন নিকৃষ্ট জীব, বটবৃক্ষ কেন উৎকৃষ্ট। ডারউইন আমাদের নিয়ে আসেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিতে যখন খণ্ডতাবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে, আর তার ঝোড়ো হাওয়ায় কুঁকড়ে পিছিয়ে গেছে পূর্ণতাবাদের তত্ত্ব।

কিন্তু আজ মনে হয়, পূর্ণতাবাদ নতুন সাজে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে; সৃষ্টি, প্রাণ আর ক্যানসার নিয়ে সে আরো প্রাঞ্জল আরো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবে। প্রশ্নপ্রবণ মানুষের অপার বিস্ময়কে আরো উসকে দিয়ে সে কোনো না কোনোভাবে স্বস্তির সন্ধান দিতে পারবে। কেননা জীববিজ্ঞানের পুরনো প্রতিনিধি হাঁপিয়ে উঠেছে, আর নতুন প্রতিনিধির হয়তো এত কিছু দেবার আছে যা পুরনোপন্থীরা ভাবতেও পারে না।

প্রসঙ্গত –

• A Commentary On Homage To Darwin Debate. With an Afterword by Professor Denis Noble. James D. MacAllister. PART 1.
http://musicoflife.co.uk/pdfs/HOMAGE_COMMENTARY_Music%20of%20Life.pdf
• A Critique of Darwin's Theory of Evolution. (Part 1). Alex Paterson.
http://www.vision.net.au/
• A New Biology for a New Century. Carl R. Woese. Microbiology and Molecular

Biology Reviews; Vol. 68, No. 2. p. 173-186. June 2004.
• Are Increasing 5-Year Survival Rates Evidence of Success Against Cancer? H. Gilbert Welch; Lisa M. Schwartz; Steven Woloshin. JAMA (Journal of American Medical association). 283:2975-2978. June 14, 2000.
• A Review of Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, Michael J. Behe. Robert L. Dorit. http://www.americanscientist.org/
• An Overview of Cancer Multidrug Resistance: A still unsolved problem. Lage. H. Cellular and Molecular Life Science. 65(20):3145 – 67. Oct 2008.
• Beyond Genetic Determinism: Toward a New Paradigm for Life. Richard Strohman. http://www.mindfully.org/
• Biology as Ideology: The Doctrine of DNA. Richard C Lewontin. Harper Perennial; Reprint edition. 1991.
• Cancer and the Human Genome: No Quick Fix. Pete Moore. The Lancet. Vol 357, Number 9255. Feb 17, 2001.
• Cancers Beget Mutations Versus Mutations Beget Cancers. Richmond T. Prehn. Cancer Research; 54, 5296-5300. 1994.
• Cancer Causation: The Darwinian Downside of Past Success? Mel Greaves. The Lancet Oncology. Vol 3, Number 4. April 1, 2002.
• Cancer Clusters: Statistically Inevitable? Elizabeth M. Whelan. Environment News. November 1999.
• Cancer: Complexity, Causation, and Systems Biology. James A. Marcum. Medicina & Storia – Seminar on Causality Models in Medicine, 2008.
• Carl Woese's Vision of Cellular Evolution and the Domains of Life. Eugene V Koonin. RNA Biology 11:3, 197–204; March 2014.
• Causality and Medicine. Joseph Agassi. The Journal of Medicine and Philosophy; Vol. I, no. 4. 1976.
• Chaos. Making a New Science. James Gleick. Penguin USA; August 2008.
• Complexity and Life. Fritjof Capra. Emergence, 4(1/2), 15–33. 2002.

• Darwin's Blind Spot: The Role of Living Interactions in Evolution. Frank Ryan. First published by Thomson/Texere 2003. http://www.fprbooks.com/Preview.pdf
• Darwin on Trial by Phillip E. Johnson, Book Review: Henry H. Bauer, Journal of Scientific Exploration 6(2), p. 181. 1992.
• DNA Is Not Destiny The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and identity. Ethan Watters. Discover Magazine, Vol. 27 No. 11. November 2006.
• Don't stop for repairs in a war zone: Darwinian evolution unites genes and environment in cancer development: Jarle Breivik. Proc. Natl. Acad. Sci. 2001. May 8. 98(10): 5379-5381...
• Evolution Theory from a New Perspective. G. Zajicek. The Cancer Journal – Vol 6, No 4. July-Aug 1993.
• Faith-Based Medicine. John A Lee. The Lancet Oncology; Vol 3, Number 7. July 2002.
• From Gaia to Selfish Genes: Selected Writings in the Life Sciences. Barlow, Connie. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.
• Genetic Determinism as a Failing Paradigm in Biology and Medicine: Implications for Health and Wellness. Richard C Strohman. Spring/Summer JSWE. Vol 39, No 2. http://www. cswe.org/ publications/ jswe/03-2strohman.htm. 2003.
• Geneticism. Medawar PB. In: The Harper Dictionary of Modern Thought, NY; Harper and Row. 1977.
• Human Genome Project in Crisis: Where is the program for life?: Richard Strohman. California monthly. April 01.
• Humble pie. John A Lee. The last word. The Lancet Oncology. Volume 2, Number 5. May 1, 2001.
• Interpreting Cancer Survival Rates. Enstrom J E, Austin D F. Science; 195: 847-851. 1977.
• Is Biology Reducible to the Laws of Physics? John Dupré. American Scientist. May-

June 2007.
• Is Our Fate In Our Genes?. Barbara Payne. http://www.prostateaction.org/research/ is our_fate.html. 2001.
• Lynn Margulis Says She's Not Controversial, She's Right. Discover Interview. APRIL 2011.
• Neo-Dawinism, the Modern Synthesis, and Selfish Genes: Are they of use in physiology? Noble D. (2011a). Journal of Physiology 589, 1007-1015.
• No Easy Answers in Cancer Debate. Gina Kolata. The New York Times. December 26, 2002.
• Nonlinearity in the Epidemiology of Complex Health and Disease Processes. Philippe P, Mansi O. Theoretical Medicine and Bioethics; 19:591-607 (Abstract). 1998.
• On the Origin of Species. Charles Darwin. (Paperback), Editor –William Bynum, Penguin Classics. Ed I. 2009
• Punctuated Equilibria: The Tempo and Mode of Evolution Reconsidered. Gould S.J., and N. Eldredge. Paleobiology, 3, pp. 115-151. 1977.
• The Biology of Cancer : A New Approach. P. R. J. Burch. Letters to the Editor. British Journal of Cancer; 35, 388; 1977. brjcancer00300-0127.pdf
• The Cytoplasmic Basis of Cellular Differentiation.... Kothari ML, Mehta LA. Journal of Postgraduate Medicine; 30:199-206. 1984.
• The Descent of Man (Paperback). Charles Darwin. Quill Pen Classics. 2008
• The Fifth Miracle: The Search for the Origin of Life. Davies P. London: Penguin Books; 1998.
• The Illusion of Certainty. Erik Rifken, PhD, and Edward Bouwer, PhD. New York: Springer Science+Business Media, 2007.
• The Music of Life: . Biology Beyond the Genes. Noble, Denis. OUP, UK. 2006.
• The Nazi War on Cancer. Robert N Proctor. Princeton University Press, 1999.
• The Problems of Cancer Biology. RR Spencer. Journal of American Medical Association. 127(9):509-514. 1945.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=273135
• The Rise and Fall of the Third Chimpanzee: How Our Animal Heritage Affects the Way We Live. Jared Diamond. Vintage Books; New Ed. Paperback – July 1, 2003. (First Pub by Radius, 1991)
• The Rise and Fall of Modern Medicine. James Le Fanu. Diane Publishing Company. 2001.
• The Role of Mutation in the New Cancer Paradigm. Richmond T Prehn. Cancer Cell International; 5:9; 2005.
• The Unravelling of Our Genetic Structure: What Makes us Human?. Terry Philpot. Manchester Guardian. Sept 2, 2000.
• Untangling the Roots of Cancer. W. Wayt. Scientific American. June 09, 2003.
• When Theories Collide: Experts develop different models for carcinogenesis. Webb T. Journal of National Cancer Institute (JNCI);93: 92-94. 2001.
• Where is the Wisdom...? The poverty of medical evidence. Editorial. British Medical Journal; 303: 198-99. October 5, 1991.
• Why Us: How Science Rediscovered the Mystery of Ourselves. James Le Fanu. Vintage Books. 2010.
• Wildlife And Plants. Vol 12;; Ed III; Publisher: Marshall Cavendish, 2007.